পরিচ্ছেদ চার

কুটিরশিল্প ও কারিগরী ব্যবস্থা

অনেক ঐতিহাসিকের মতে মুঘল-ভারতের কুটিরশিল্পের উৎপাদন পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের তুলনায় সব থেকে বেশি ছিল যার বিনিময়ে অঢেল বিদেশী মুদ্রা ভারতে আসত। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার বলেছেন যে সোনা বা রুপা ভারতে একবার ঢুকলে আর বেরোয় না। বলা হচ্ছে যে মুঘল-ভারত ছিল স্বনির্ভর। বিদেশ থেকে মুদ্রা ও কিছু অস্ত্র, ঘোড়া, মদ ও কয়েক ধরনের ওষুধ ছাড়া আর কিছু আমদানি করার প্রয়োজন ছিল না। কুটিরশিল্পে অত্যধিক উৎপাদনের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এর মধ্যে নতুন কোনো যন্ত্র বা প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার করতে দেখা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে নতুন কৃৎকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার যে ব্যবহার শুরু হয়েছিল ভারতে ঐ ধরনের ব্যবহার না হওয়ার ফলে ভারত পিছিয়ে পড়তে থাকে। প্রয়াত ঐতিহাসিক আথার আলি একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই মতের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলছেন যে মুঘল-ভারতের বাণিজ্য ছিল প্রধানত মূল্যবান বা অতিসাধারণ পণ্যের। যেহেতু যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্য উৎপাদনের সামান্য একটা অংশ নিয়েছিল। প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ছিল পরস্পরানির্ভর ও বহু জায়গাতেই কিছুই ছিল না। সুতরাং স্বনির্ভর বলতে যেটা বোঝাচ্ছে সেটি আসলে বিনিময় প্রথার দুর্বলতা, যার ফলে উৎপাদনের চাহিদা কম ও উৎপাদন বাড়তে পারছে না। জাতপাতের বাধানিষেধ ও সরকারী শোষণ নীতির ফলে উৎপাদন ও তার ধরন এক জায়গায় থমকে ছিল এবং একেবারে গতানুগতিক পথে চলছিল। ফলে অষ্টাদশ শতক থেকে যখন ইউরোপে উৎপাদনের মান বাড়ছে ও নতুন প্রযুক্তি ও যন্ত্রের উদ্ভব হচ্ছে মুঘল ভারত তখন পরম্পরা অনুযায়ী কাজ করছে।

এই দুই মতবাদের মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন নিহিত আছে ও এসব তথ্য, যার উপর নির্ভর করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেগুলি কতটা প্রমাণগ্রাহ্য সেটা বিবেচনা করা প্রয়োজন। সব তথ্যও পাওয়া যায় না। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্য সাধারণত ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির কাগজপত্র থেকে পাওয়া যায় যার মধ্যে ভারতীয় বণিকদের লগ্নির ফলে কত লোক কাজ করছে, তারা কোথায় কোথায় কীভাবে বাণিজ্য করছে এসব পাওয়া যায় না। আমরা পরে এ নিয়ে আলোচনা করব।

মুঘল যুগে যে শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বাড়ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। আমরা প্রথম জানি যে মুঘল সাম্রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল সামান্য। দুশো বছরে জনসংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়েছিল বলে ধরা হয়। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে গরিব কৃষক ছাড়াও সচ্ছল বর্ধিষ্ণু কৃষকের কথা পাওয়া যায়। নগদ টাকায় খাজনা (শস্য থেকে রূপান্তরিত করে) নেওয়ার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিও বদলে যেতে থাকে। গ্রামে শরফ বা মহাজনের উপস্থিতি ষষ্ঠদশ শতকের শেষে পাওয়া যায়। আকবরের সমকালীন ঐতিহাসিক নিজামুদ্দিন তিন হাজার দুশোটি কসবা বা বাজার-শহরের উল্লেখ করেছেন যার সঙ্গে বাংলার গঞ্জের তুলনা করা যায়। এগুলির অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে ছিল যার ফলে পণ্য বিনিময়ের আভাস পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ছিল এর থেকে সহজেই বলা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ গরিব অবস্থার মধ্যে কাল কাটাচ্ছিল। সমকালীন ভারতে ঐ ধরনের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মুঘল-ভারতের সব বিদেশী পর্যটকই বলেছেন মুঘল-ভারতের জনসাধারণ ছিল খুবই গরিব। এদের কুঁড়েঘরে কোনো আসবাব বা তৈজসপত্র না থাকায় ইউরোপীয় পর্যটকরা এদেরকে অত্যন্ত গরিব বলে ধরেছেন। এদের পর্যাপ্ত পরিমাণ জামা-কাপড় গায়ে না থাকায় এদের সম্বন্ধে মত প্রকাশের অবকাশ হয়নি। তবে আপামর সব কৃষক বা শ্রমিক যে গরিব ছিল এটা মনে করা ভুল হবে। ষষ্ঠদশ শতকের শেষদিকের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সম্পন্ন কৃষক ছিল। অন্যান্য সমকালীন ও পরবর্তী ফার্সী সূত্র থেকে জানা যায় যে বহু সচ্ছল কৃষক ছিল যারা নিজেদের ক্ষেতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করেছিল। এদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সমাজের মধ্যে বণিকদের অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত ভালো যা নিয়ে পরে আলোচনা করব। কতকগুলি পণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের টুকরো খবর থেকে মনে হয় কতকগুলি বণিক ভালোভাবেই বাণিজ্য করছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে জমিদারদের উৎসাহে বাংলায় যে সব পত্তনি হচ্ছিল সেখানেও বাণিজ্য ভালোই চলছিল বলে জেসুইট পাদ্রিরা মনে করেছেন। ছোট ছোট গড়ে ওঠা শহরের মেয়েরা হাতে-পায়ে হাতির দাঁতের ও রুপোর গয়না পরছে বলে তাঁরা দেখেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক ওলন্দাজ পর্যটক বাংলার উপকূলে বণিকদের বাড়িতে কাঠের টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি দেখেছেন। ইউরোপীয় কৃষ্টির প্রভাব অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই বাংলায় এসেছিল। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লবণের গুরুত্ব ছিল বেশ বেশি। এক ইউরোপীয় পর্যটকের মতে আগ্রা থেকে বাংলাতে দশ হাজার টন লবণ পাঠানো হত। ১৬৭০ সালের পর বাংলাতে তামিলনাড়ু থেকে লবণ আসত যার অনেকখানি যেত পাটনাতে। সেখান থেকে ঐ লবণ সারা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, বিশেষত তিব্বত ও ভুটানে যেত। আর্মেনিয়ান

Scanned with CamScanner

বণিকরা এই ব্যবসা করত বলে জানা যায়। লবণ ছাড়া বাংলার চিনি বহুকাল ধরেই সারা ভারতে চলছিল। উত্তর ভারতের মিষ্টি সাধারণ লোকেরাও খেত। গবাদি পশু ও চারণভূমি বেশি থাকায় দুধ পাওয়া যেত সহজেই এবং কম দামে। উত্তর ভারতের শহরের গরিবরা দিনান্তে ঘি খেত বলে বলা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই পর্যটক পাদ্রি মানরিক ভারতের শহরের বিশাল বিশাল বাজারের কথা বলেছেন। ওঁর বর্ণনা থেকে মনে হয় যে শহরের গরিবরা নানান ধরনের সুস্বাদু খাবার খেত যেগুলি ছিল নিরামিষ। বাংলাতে অসংখ্য নদীনালা থাকায় মাছ সহজলভ্য ছিল বলে মনে হয়। মুঘল সম্রাটরা মদ প্রস্তুত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিলেও নিকোলাই মানুচ্চি দিল্লিতে মদ তৈরি করার কথা বলেছেন। চাল থেকে তৈরি করা *আরাক* বা গুড় কি মহুয়া থেকে মদ তৈরি করার কথা পাওয়া যায়। মানুচ্চি অবশ্য বলেছেন যে হিন্দুদের বাড়িতেই এইসব বেশি তৈরি হত।

পর্যটকরা বলেছেন যে গরিবরা সামান্য কাপড় পড়ত। কিন্তু শহরের গরিবদের কয়েকটি অংশের মধ্যে কাপড়ের চাহিদা ছিল খুব বেশি। সৈন্যদের নিজস্ব আলাদা পোশাক না থাকলেও শরীর ঢাকার ব্যবস্থা করতে হত সম্ভবত মোটা কাপড়ে। অভিজাতরা বহু অনুগামী নিয়ে বাইরে বেরোতেন। ঐ অনুগামীরা প্রভুর সম্মান রক্ষার মত জামাকাপড় পরত। মুঘল যুগের সমকালীন চিত্রকলায় যেসব কারিগরদের দেখা যায় তারা সকলেই দর্জির তৈরি পোশাক পরেছে। তাদের প্রায় সকলেরই মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ি ও পায়ে নাগরী জুতো আছে। মুঘল যুগে, অন্তত সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নতুন শহর ও বিশাল বাজার গড়ে উঠেছিল যেখানে বিশাল সংখ্যক কারিগরের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং অন্তত ঐ সময়কাল পর্যন্ত শহরে কারিগরদের পোশাকের যে বড় চাহিদা ছিল এটা ভাবা অন্যায় হবে না।

শহরের কারিগররা পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করলেও শহরের মধ্যে পাকা বাড়ি বা পাকা ঘর তৈরি করার মতো অবস্থায় ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বার্নিয়ার জৌলুসময় দিল্লির বর্ণনা দিতে গিয়ে কারিগরদের কুঁড়েঘরের কথা বলেছেন যেগুলি ভয়াবহ আগুনে পুড়ে যায়। ঐদিক থেকে শহরের কারিগরদের বাসস্থানের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের কারিগরদের বাসস্থানের বিশেষ প্রভেদ ছিল না। আর্থিক ব্যবস্থার স্পষ্ট বিতরণ না হওয়ার ফলে সমাজের যে ছোট একটা অংশ সবরকম সুবিধা পেত তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। ফলে শহরের বিন্যাস ও চেহারা একপেশে হয়ে দাঁড়ায় যেখানে কয়েকটা পাকাবাড়ির পর কুঁড়েঘরের সারি। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকা শহরের বর্ণনায় এই ছবিই দেখা যায়।

বার্নিয়ারের মন্তব্যর উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড বলেছিলেন যে মুঘল ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না। ফলে বাইরে সাধারণ ছোট বাড়ি থাকার কথা নয়।

১৯৭৫ সালে ইখতিদার আলম খান দেখাচ্ছেন যে বার্নিয়ার ও মোরল্যান্ডের মন্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। উনি মধ্যবিত্তদের মধ্যে ধরেছেন সাধারণ নিচুস্তরের আমলা, নিম্নর জমির স্বত্বভোগকারীদের ও পেশাদারী লোকেদের। বলা বাহুল্য এদের হাতে কিছু অর্থ ছিল এবং নানান পণ্যর চাহিদা ছিল যার ফলে মুঘল-ভারতে শিল্প- উৎপাদন বাড়তে থাকে। এই শিল্পোৎপাদন যে জাতপাতের বিভাজনের উপরে দাঁড়িয়ে চলছিল তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা পাই বণিক বানারসী দাস, আবদুর রহিম খান-ই-খানান ও ইউরোপীয় পর্যটক পেলসার্টের লেখা থেকে। এর মধ্যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁতি, দর্জি, নাপিত, হালুইকর, তেলি, ছুতোর, কাহার, রাজমিস্ত্রী, স্বর্ণকার, চিত্রকর, ধাতুশিল্পী, গালিচা তৈরির কারিগর ইত্যাদির। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে মুকুন্দরাম বাংলাতে এই ধরনের বহু পেশাদারী লোকের কথা বলেছেন। এনিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ঐসব পেশা সুলতানি যুগ থেকেই চলে আসছিল।

বণিকদের একটা বড় অংশকে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায়। কিন্তু দু-একটি জায়গা ছাড়া হিন্দু বণিকদের জীবনযাত্রার মধ্যে ভোগের ছাপ কম। কোনো কোনো ইউরোপীয় পর্যটক, যেমন জন ফ্রায়ার বলছেন যে হিন্দু বণিকরা তাদের অর্থ নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকত রাজরোষ এড়ানোর জন্য। উনি বলছেন যে পশ্চিম ভারতের শহরে হিন্দু বণিকরা তাদের গরু-ছাগল ইত্যাদি নিয়ে একটা ঘরের মধ্যে থাকে। অন্যদিকে মুসলমান বণিকরা ভালো জামা পরে, বড় বাড়িতে বহু দাসদাসী নিয়ে থাকত।

ফ্রায়ারের এই বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে মানা শক্ত। ওলন্দাজদের আঁকা সুরাট বা অন্য শহরের যে ছবি পাওয়া যায়, সেগুলি বড় বড় বাড়ির চেহারা দেখায়। পেলসার্ট বলেছেন যে আগ্রাতে হিন্দু বণিকরা উঁচু বাড়িতে বাস করত। সপ্তদশ শতকের প্রথমে এক ইউরোপীয় পর্যটক ঢাকা শহরে এক হিন্দু বণিকের বাড়িতে স্তূপীকৃত মুদ্রা দেখেছেন যেগুলি ওজন করে গোনা হচ্ছে। মীর্জা নাথান *বাহারিস্তানে* লিখেছেন যে সুবাদার ইসলাম খান ঢাকার পাইকারদের কাছ থেকে এক রাতে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করেছিলেন। আসলে বিদেশী পর্যটকদের কাছে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ থেকে আলাদা। ভারতে মুসলমান অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ছাপ স্বভাবতই তাদের সম্প্রদায়ের বণিকদের জীবনযাত্রায় ছাপ ফেলেছিল। হিন্দু বণিকদের জীবনযাত্রার মধ্যে যদি এতটা ভোগবিলাস না থাকে, তার জন্য হিন্দু বণিকদের উপর মুসলমান শাসকের অত্যাচারকে দায়ী করা অসঙ্গত হবে।

তাছাড়া প্রমাণ আছে যে হিন্দু বণিকরাও বিলাসবহুল জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। ১৬৭০ সালের আগে সুরাটে হিন্দু ও জৈন বণিকরা শহরের মধ্যে বড় বড় বাড়িতে থাকতেন। শহরের বাইরে তাঁদের বাগানবাড়ি ছিল যেখানে তাঁরা সপ্তাহান্তে বিশ্রামের

Scanned with CamScanner

জন্য যেতেন। নানান কারণে ১৬৭০ সালের পর থেকে সুরাটে ওদের এই অধিকার সঙ্কুচিত হতে থাকে। সুতরাং দুই সম্প্রদায়ের বণিকের মধ্যেকার জীবনযাত্রার বৈষম্য কেবল সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার নয়, এর পিছনে পরম্পরা ও সামাজিক কারণ রয়েছে। এটাও বলা দরকার যে সুলতানদের মতই মুঘল সম্রাটরা বণিকের অধিকার ও তাদের জগতে হস্তক্ষেপ করেননি। এরই সুবিধা বিদেশী বণিকরা নিতে চেষ্টা করলে সরকারের সঙ্গে তাদের গোলমাল শুরু হয়ে যায়।

শহরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তদের জন্য যেসব বাড়ির চাহিদা ছিল সেগুলি ক্রমশ বাড়ছিল। পাথরের থেকে ইঁটের ব্যবহার, কাঠ ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় শহরে কারিগর ও শিল্পের ব্যবহার বাড়তে থাকে। পরে আমরা শহরের এইসব বাড়ির গড়ন ও চেহারা লক্ষ্য করব। এসব বাড়িতে কাঁথা, মাদুর, গালিচা ও রেশমের ওয়াড়পরা বালিশ থাকত। বড়লোকদের বাড়িতে খাটের পায়া ধাতুতে মোড়া থাকত। বড়লোকদের বাড়িতে চীনামাটির সুদৃশ্য তৈজসপত্র, ধাতুর তৈরি জিনিসপত্র ইত্যাদি ছিল। ধনী অভিজাতরা জেড পাথরের তৈজস ব্যবহার করতেন সম্ভবত এই ধারণায় যে এতে বিষ প্রয়োগ করলে বোঝা যাবে। বড় মুসলমান বণিকরা বাংলাতে ইউরোপীয় আসবাব ব্যবহার করত তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

পথঘাটের ব্যবস্থা অপ্রতুল হওয়ায় অভিজাতরা ঘোড়া ও পালকি ব্যবহার করতেন যার জন্য বিভিন্ন সরাইখানাতে সুবন্দোবস্ত ছিল। সাধারণত লোক পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে যাতায়াত করত। সুরাটে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিকরা গরুর গাড়ি চড়তেন। এগুলি রেশম বা অন্যান্য মূল্যবান কাপড়ে ঢাকা থাকত। টমাস রো জাহাঙ্গিরকে ঘোড়ায় টানা ফিটন গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন সেটি পথের অভাবে ভালোভাবে চালানো যায়নি।

মুঘল অভিজাতদের কাছে বস্ত্রের মান ও বারবার পোশাক পাল্টানো ছিল তাদের কাছে গৌরবের বিষয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসি পর্যটক লিখছেন যে আগ্রার হিন্দু ব্যবসায়ীরা কাশ্মীরের শাল ও পায়ে রেশমের জুতো ব্যবহার করে। পুরুষদের কাপড়ের মধ্যে রেশম ও ব্রোকেড ছিল প্রধান এবং দর্জিকে দিয়ে পোশাক তৈরি করানো হত। এই ধরনের পোশাক শুধু মুসলমান আমীররাই পরতেন এরকম ভাবার কারণ নেই। উচ্চপদস্থ হিন্দু মনসবদাররা যে এই ধরনের পোশাক পরতেন (পোশাক পরার মধ্যে ছোট একটা তফাত ছিল যাতে সহজেই হিন্দু বলে বোঝা যায়) সেটা আমরা সমকালীন মুঘল চিত্রকলা থেকে দেখতে পাই। বলা নিষ্প্রয়োজন পুরুষ ও মহিলারা উভয়েই অলংকার ব্যবহার করতেন।

আগেই দেখা হয়েছে যে মনসবদারদের ক্ষুদ্র একটা অংশ রাষ্ট্রের প্রধান আয় ভোগ করতেন। আকবরের সময়ে নিচুস্তরের একহাজারী মনসবদারদের বর্তমান কালের

আলোকে মাহিনার মূল্যমান ধরা হয়েছে মাসে প্রায় পনেরো হাজার টাকার সমান। এর অধিকাংশই চলে যেত বিলাস-ব্যসনে। মোরল্যান্ড অবশ্য বলেছেন যে এই আয়ের বেশির ভাগই লুকিয়ে রাখা হত। এই বিলাসদ্রব্যর মধ্যে বিদেশীপণ্য প্রায় কিছুই ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে ইউরোপীয় বণিকরা সিরাজের মদ ও ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র বিক্রির জন্য আনতে থাকে। ঘড়ি তখন প্রচলিত হলেও ভারতে তখনও চলেনি। অর্থাৎ শহরের বিশাল শিল্পসম্ভার মনসবদারদের ভোগে যাচ্ছে। কিন্তু বার্নিয়ার বলছেন যে, মনসবদাররা তাদের দরজায় কোড়া (চাবুক) ঝুলিয়ে রাখত এবং জোর করে কারিগরদের দিয়ে কাজ করাত। এই বক্তব্যর বিরোধিতা সহজেই করা যায়। অসংখ্য ছোট বড় শহরের বাজারে যে প্রচুর পণ্য বিক্রি হচ্ছিল সেটা চাবুক মেরে করা যায় না। দেশে যে খোলা বাজার ছিল এবং বাজারী অর্থনীতিতে সেখানে মূল্য নিয়ন্ত্রণ হত। সাধারণভাবে শাসকরা এই জগৎ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেনি দু-একটি সাময়িক ব্যতিক্রম ছাড়া। অষ্টাদশ শতকের প্রথমে বাংলার সুবাদার আজিমুদ্দিন *সওদা-ই খাস* ও আম করে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলে বৃদ্ধ সম্রাট তাঁর নাতিকে নিরস্ত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান এই ধরনের কাজ করতে গিয়েছিলেন, বিশেষ সাফল্য পাননি। ভারতের আভ্যন্তরীণ বিশাল বাজারের কথা চিন্তা করলে বার্নিয়ারের কারিগরদের উপর জোর করা মেনে নেওয়া যায় না।

বড় বড় ওমরাহরা সম্রাটের আচার-ব্যবহার, ভোগবিলাস অনুকরণ করতেন। একজন ইউরোপীয় পর্যটক বড় এক মনসবদারের প্রাসাদোপম বাড়ি ও তার ঐশ্বর্যের কথা বর্ণনা করার ভাষা খুঁজে পাননি। বার্নিয়ার ডাক্তার হিসাবে হারেমে গিয়েছিলেন। সেখানে সূক্ষ্ম কাপড়, রেশম, ব্রোকেড, মণিমুক্তা, সুগন্ধী ইত্যাদি ছড়াছড়ি যেতে দেখেছেন। মনসবদাররা অনেক সময়েই তাঁবুতে কাল কাটাতেন। ফলে বিশাল তাঁবু বিলাস-ব্যসনে ঢাকা তৈরি করা হয়েছিল যার বর্ণনা আবুল ফজল দিয়েছেন। এমনকি ঘোড়া ও হাতির জিন ও রেকাব সোনা মুড়ে করা হত। ১৬৮৪ সাল নাগাদ আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে মুদ্রার সংকটের মধ্যে পড়লে তিনি সুরাটের টাঁকশাল থেকে কারিগর আনিয়ে তাঁর ঘোড়া ও হাতির সোনা-রুপোর রেকাব খুলে মুদ্রা তৈরি করান। আবুল ফজল বলছেন যে আকবরের জন্য প্রতি বছর একহাজার জামা তৈরি করানো হতো। এক বছর বাদে ওগুলি ভৃত্যদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হত। আর একজন পর্যটক বলেছেন যে প্রতিদিন সম্রাটের খাবার ও জামাকাপড়ের জন্য দশ হাজার টাকা খরচ করা হত। আবুল ফজল বলছেন যে ওঁর হারেমের প্রতিদিনের খরচ বরাদ্দ ছিল ত্রিশ হাজার টাকা। মোরল্যান্ড বলছেন যে অলংকার ছাড়া ওমরাহদের সব থেকে বেশি খরচ হত তাদের আস্তাবলে। ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার রাখার জন্য ওমরাহরা আলাদা টাকা পেত যেটা নির্ভর করত তাদের *সওয়ার* পদমর্যাদার উপর।

Scanned with CamScanner

ওমরাহরা যে শুধু সম্রাটের ভোগবিলাস বা আচার-ব্যবহারই অনুকরণ করত তা নয়, জনহিতকর কাজের জন্য খরচ করত সম্ভবত সম্রাটের নেকনজরে পড়ার জন্য। ফলে তারা বড় বড় শহরে, বিশেষত দিল্লিতে, মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা এমনকি হাসপাতালও করে দিয়েছিল। এসবের ফলে সৌধ নির্মাণের কারিগরদের চাহিদা বেড়ে যায়। শাহজাহানাবাদ তৈরি করা থেকেই এই জোয়ার দেখা যায় যেটা ষষ্ঠদশ শতকের শেষে কিছুটা থেমে ছিল। এর ফলে কারিগরী পণ্য ও কাজের লোকের চাহিদা বাড়তে থাকে। সরকারী কারখানাগুলি আরও উন্নত হলে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বাড়তেই থাকে যার বর্ণনা বার্নিয়ার দিয়েছেন।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে যার ফলে কারিগর ও তার পণ্যের চাহিদাও বাড়তে থাকে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে উৎপাদনও ঐ একই সঙ্গে বাড়ছিল। মুঘল যুগের শান্তি ও শৃঙ্খলা ও নগরায়ণের ফলে বাজারি পণ্যরও চাহিদা বাড়তে থাকে যার মধ্যে ছিল অনেকখানি কারিগরী পণ্য। সুতো, সোনার জরি, কাঁচা রেশম, জাহাজের জন্য ধাতু, বস্তা, কাঁচের বাক্স, দড়ি ইত্যাদির চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি বিভিন্ন জায়গায় কুঠি বসিয়ে কারিগরী পণ্য কিনতে থাকে, ফলে দ্বিতীয়ার্ধে চাহিদা প্রচণ্ড বেড়ে যায়। এতে অবশ্য কৃষক বা কারিগরের কোনো সুবিধা হয়েছিল বলে মনে হয় না। তারা সেই তিমিরেই পড়েছিল। অবশ্য কাজ পাওয়ায় জীবনযাত্রার কিছুটা সুরাহা হয়েছিল বলে বলা যেতে পারে। সরকারী ও বেসরকারী চাহিদা বেড়ে যাবার ফলে কারিগরী উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু ঐ উন্নয়নে সমতা ছিল না। কোনো কোনো জায়গায় কারিগর ও কাঁচামালের একত্র সংস্থান হওয়ায় সেখানে উৎপাদন নাটকীয়ভাবে এগিয়ে চলেছিল। আর কোনো জায়গায় হয়ত বিশেষ কিছুই হয়নি। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি বিশাল চাহিদার সুবাদে নানান ধরনের কাপড়ের উৎপাদন যে পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলগুলিতে বেড়েই চলেছিল তাতে সন্দেহ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইংরেজ কোম্পানির দাপটে ও মারাঠাদের সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখার চেষ্টায় এই স্বর্ণযুগ শেষ হতে থাকে।

মুঘল যুগে কারিগরী উৎপাদন ও তার বৈচিত্র্য নিয়ে ইউরোপীয় পর্যটকরা, বিশেষত বার্নিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করলেও বর্তমান কালের ইংরাজ ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড মানতে চাননি। উনি বলেছেন যে বিদেশী পর্যটকরা সাধারণত বড় জলপথ বা স্থলপথ ধরে গিয়েছেন, ভারতের মধ্যের খবর তাঁরা রাখতেন না। সাধারণত যাতায়াতের পথের শহরগুলি দেখেই ওঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। মোরল্যান্ড বলছেন যে আপামর জনসাধারণ অত্যন্ত গরিব ও তাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই। সুতরাং দেশের একটা বড়

অংশে কোনো কারিগরী উৎপাদন নেই। কেবল তাঁতের কাপড়ের উৎপাদনে ভারত যে স্বনির্ভর ছিল এবং ঐ তাঁতের কাপড় যে সারা বিশ্বের বাজারে চলত সেটা মোরল্যান্ড স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

তাঁতের কাপড় ছাড়াও বিদেশী পর্যটকরা আরো অনেক উৎকৃষ্ট কারিগরী পণ্যর কথা বলেছেন। একদিকে যেমন বড় বড় শহরে কারিগররা কাজ করছে, অন্যদিকে বাঁধা পথের বাইরেও পর্যটকরা এইসব পণ্য তৈরি হতে দেখেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসি কোম্পানির বণিক মার্তাঁ সুরাট থেকে হাঁটাপথে মসুলিপত্তনমে আসেন। মারাঠাদের গোলমালের ফলে ওঁকে ঘুরপথ নিতে হয়েছিল, যেখানে তিনি ইন্দুর থেকে ইস্পাত তৈরি হওয়ার কথা বলেছেন। ঐ ইস্পাত দামাস্কাসের বিখ্যাত তরবারী করার জন্য পাঠানো হত। আবুল ফজলও ইন্দুরে ইস্পাত তৈরির কথা বলেছেন।

কারিগররা যে বিভিন্ন জাতে বিভক্ত ছিল প্রধানত পেশা অনুযায়ী একথা আমরা পঞ্চদশ শতকের শেষে বাংলা সাহিত্যে পাই। বিভিন্ন ধরনের কারিগরদের জাতের তালিকাও পাওয়া যায়। এইসব পেশাগত দক্ষ শ্রমিকদের সমাবেশের নানান কারণ ছিল—সহজলভ্য কাঁচামাল, কাছে বাজার, বণিকের লগ্নি করার জন্য উপস্থিতি ইত্যাদি। ফলে কোনো কোনো বিশেষ জায়গায় কারিগররা ভিড় করে যাদের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বন্দর ও বাণিজ্য। সুতরাং যাতায়াতের পথের ধারে কয়েকটি শহরে কারিগরী উৎপাদন সীমাবদ্ধ ছিল একথা মনে করার কোনো কারণ নেই।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সময়কালকে সাধারণত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের স্বর্ণযুগ বলে ধরা হয়। এর মধ্যে তাঁতের শিল্প প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। বলা যায় যে দেশের সর্বত্রই স্থানীয় চাহিদার জন্য ও বাণিজ্যের জন্য এই শিল্প গড়ে উঠেছিল। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের ও মানের কাপড় তৈরি হতে থাকে। সমকালীন দলিলে প্রায় পনেরশো ধরনের কাপড়ের নাম পাওয়া যায় যার অধিকাংশকেই চিহ্নিত করা যায়নি। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশই টুকরো কাপড় বা তৈরি কাপড়। সম্ভবত মোটা কাপড় বা ক্যালিকো ছিল এদের মধ্যে প্রধান। তাছাড়া ছিল সূক্ষ্ম তাঁতের কাপড় বা মসলিন। সাদা, রঙিন, নক্‌শাকাটা (এগুলি তাঁত যন্ত্রেই রঙিন সুতো দিয়ে বোনা) বা ছাপা অথবা তুলি দিয়ে আঁকা কাপড় পাওয়া যেত। এইসব কাজের উপর বা সুতোর বুনটের উপর কাপড়ের দাম নির্ভর করত। একই ধরনের কাপড় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম দেওয়া হত। বাংলাতে ক্যালিকোকে *ধুতি* ও গুজরাটে *বাফতা* বলা হত।

দেশের প্রায় সব জায়গাতেই কাপড় তৈরি হলেও, কতকগুলি জায়গায় বিশেষ কতকগুলি কাপড় তৈরি হত। মসলিন তৈরি হত সাধারণত দাক্ষিণাত্য ও বাংলাতে। তাঁত ও রেশম মিশ্রিত কাপড় হত গুজরাটে এবং চিত্রিত কাপড় পাওয়া যেত দক্ষিণ

Scanned with CamScanner

করমণ্ডল থেকে। কতকগুলি শহরে বিশেষ ধরনের কাপড় বিক্রি হত এবং অনেক সময়েই শহরের নামে কাপড়ের নামকরণ করা হয়েছিল।

পরনের কাপড় ছাড়া, তাঁতের কার্পেট, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, বড় আকারের রুমাল, বাংলার কাঁথা, সিন্ধুর মাদুর, মোটা কাপড়ের তাঁবু ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে তৈরি হত। অভিজাতদের কাছে বড় ও ভালো তাঁবুর প্রয়োজন বেশি ছিল। আবুল ফজল এগারো রকম তাঁবুর বর্ণনা দিয়েছেন। বড় একটা তাঁবু ছোট একটা বাড়ির সমান ছিল এবং এর দাম পড়ত দশ হাজার টাকা। এই ধরনের বড় তাঁবু খাটাতে দু-তিন দিন লেগে যেত। তাঁবুর মূল অংশটি ছিল তাঁতের যদিও তার সঙ্গে রেশম, ভেলভেট ইত্যাদি মেশানো থাকত।

তাঁতের সুতো কাটা বা তৈরি করা আলাদা কাজ বলে ধরা হত। সাধারণত, তাঁতির পরিবাররা এই কাজ করতেন। মুকুন্দরাম ষষ্ঠদশ শতকের শেষে লিখছেন যে মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে তাঁতির পরিবাররা এই কাজ করছে এবং ফাঁকি দেবার সুযোগ খুঁজছে। এরা ছাড়াও ক্রমশ চাহিদা বেড়ে যাবার ফলে স্বাধীনভাবেই কিছু লোক পেশা হিসাবে নিতে থাকে। ক্রমশ দেখা যায় যে উপকূলের কয়েকটা জায়গা সুতো তৈরি ও বিক্রির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ভারুচ (ব্রোচ), বালেশ্বর, কাশিমবাজার ইত্যাদি। মসলিনের সূক্ষ্ম তাঁতের সুতো অবশ্য পাওয়া যেত ঢাকা থেকে যদিও সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকাতে অন্যান্য ধরনের কাপড় পাওয়ার কথা ইউরোপীয় দলিলে বলা হচ্ছে। ইউরোপীয় কোম্পানির গুজরাট ও বাংলা থেকে সুতো কিনে ইউরোপে চালান দিত। কিন্তু ওরা কিনত প্রধানত মোটা সুতো কারণ ইউরোপীয় কারিগররা সরু সুতোয় কাজ করতে পারত না। সব থেকে সরু সুতোতে তৈরি হত মসলিন যা পাওয়া যেত ঢাকা থেকে। কিন্তু গুজরাট থেকে সুতো আমদানি করত বাংলা। অর্থাৎ বাজারী চাহিদা অনুযায়ী বাংলাতে সুতো উৎপাদন হচ্ছিল না। এসম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। ঐ একই সময়ে গুজরাটে সুতোর উৎপাদন বাড়ছিল। ১৬৮০ সালের পর সুরাট থেকে বাংলাতে সুতো আমদানি বাড়তে থাকে। ১৭০১-০২ সালে চোদ্দ হাজার মন সুতো বাংলাতে সুরাট থেকে আমদানি করা হয়। ১৭১৩ সালের মধ্যে এটিই ছিল সব থেকে বেশি আমদানি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুখে সবথেকে বেশি আমদানির কারণ হচ্ছে বিগত কয়েক বছরে শোভা সিংহ ও রহিম খানের বিদ্রোহের ফলে বাংলার উৎপাদন ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গিয়েছিল।

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই বাংলার রেশমের উৎপাদন ও বিক্রি বেড়ে চলছিল। এর আগে গুজরাটে ও কাশ্মীরে রেশমের উৎপাদন ছিল যদিও সেটি ছিল সামান্য। বিদেশী পর্যটকরা বলছেন যে, আগ্রা, লাহোর, ফতেপুর ইত্যাদি শহর রেশম

তৈরির কেন্দ্র ছিল। আবুল ফজল বলছেন যে আকবরের রেশম তৈরিতে বিশেষ উৎসাহ ছিল এবং তিনি বিদেশ থেকে রেশম তৈরির কারিগর নিয়ে আসেন। ফল খুব সন্তোষজনক হয়েছিল বলে মনে হয় না রেশমের গালিচা তৈরি করা ছাড়া। সেগুলোতে তখনও ইরানী নক্‌শা ব্যবহার করা হচ্ছিল যার থেকে মনে হয় যে ইরানী কারিগর ও তাদের বংশধরেরা এই ধরনের কাজ করছিল। আবুল ফজল এই ধরনের গালিচা তৈরির যে কেন্দ্র করা হয়েছিল তার উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত গুজরাট চিন থেকে রেশম আমদানি করছিল। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে চিনা পর্যটক মা-হুয়ান বাংলাতে তুঁত পোকা থেকে রেশম তৈরি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন, যদিও বলেছেন যে চিনের রেশমের মান অনেক উন্নত। ক্রমে গুজরাট বাংলা থেকে রেশম নিয়ে শুরু করলে চিন থেকে রেশম আমদানি কমে যায়। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে চিন থেকে রেশম আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। ততদিনে ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি বাংলা থেকে কাঁচা রেশম ইউরোপে পাঠাতে শুরু করেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের ফরাসি পর্যটক তাভারনিয়ার জানাচ্ছেন যে কাশিমবাজারে তেইশ লক্ষ পাউন্ড কাঁচা রেশম হত যার দুই-তৃতীয়াংশ যেত গুজরাটে। কেউ কেউ ধরেছেন যে এটা সারা বাংলার উৎপাদন। রেশমের কাপড় বা গালিচা তৈরি করা ছাড়া রেশম ব্যবহার করা হত গুজরাটের বিখ্যাত তাঁত মিশ্রিত *পাটোলা* কাপড়ে। তাঁবুতে সোনার জরির সঙ্গে মিশিয়ে কাপড় তৈরি করা হত যেগুলি অনেক সময়ে বিভিন্ন রঙের হত। সাটিন ও টাফেটার সঙ্গে ও রেশম মেশানো হত। ঐ সময়কার পৃথিবীতে এত বৈচিত্র্যময় কাপড় আর কোনো দেশে তৈরি হত বলে জানা যায় না। আসামে মোটা রেশমের মুগা ও তসরের কাপড়ের কথাও পাওয়া যায়।

মোরল্যান্ড লিখেছিলেন যে ভারতের সমকালীন ফার্সী সাহিত্যে পশম বা উলের উল্লেখ নেই। আবুল ফজল তাঁর *আইনে* যে তালিকা দিয়েছেন তাতে পশম বা উলের উল্লেখ আছে। বার্নিয়ার কাশ্মীরের উলের শালের কথা বলেছেন। তিনি তিব্বতী ভেড়ার পশমেরও উল্লেখ করেছেন। আকবর পশমের গালিচা তৈরির কারখানা খুলেছিলেন আগ্রা, লাহোর ও পাটনাতে। অন্যান্য শহরেও ঐধরনের গালিচা তৈরি করার চেষ্টা করা হয়। মনে হয় আকবরের এই প্রচেষ্টা ঐ সময়ে বিশেষ সাফল্য পায়নি। আকবর পারস্য দেশ থেকে কারিগর আনিয়ে ঐধরনের গালিচা তৈরি করার চেষ্টা করেন। বাংলাতে গালিচা তৈরির কারিগরের উল্লেখ বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় যদিও খুব পরিষ্কার নয় যে এরা পশমের গালিচা তৈরির কারিগর। ইংরেজ কোম্পানি ভারতে প্রথম প্রথম তাদের পশম বিক্রি করার প্রচুর চেষ্টা করে সাফল্য পায়নি।

Scanned with CamScanner

শণে বাঁধা দড়ির উল্লেখ থাকলেও বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না। শণের দড়ি পাওয়া যেত কাশিমবাজারের কাছে। ফরাসি পর্যটক তাভারনিয়ার দাক্ষিণাত্যে একধরনের দড়ির নাম করেছেন, যাকে বলা হত *তাভা*। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে *পট্টবস্ত্রের* কথা পাওয়া যায়। কেউ কেউ একে বর্তমানের পাট বলে ধরেছেন। মোরল্যান্ড বলছেন যে বাংলায় গরিবশ্রেণী পাটের কাপড় পরত। কিন্তু এই পাট বর্তমানের পাট নয়। মধ্যযুগে পট্টবস্ত্র হচ্ছে বুনো রেশমের কাপড়। আবুল ফজল একে তাঁত বস্ত্র বলে বলছেন। যেটা মুঘল যুগে, বিশেষত সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পরিষ্কার হয়ে আসে, সেটা হচ্ছে যে কাপড় তৈরির কয়েকটা আনুষঙ্গিক কাজ স্বাধীন পেশাতে পরিণত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে রং করা, ছাপ লাগানো ইত্যাদি। সুলতানি যুগের শেষ থেকেই সম্ভবত রং করার কাজ আলাদা পেশা হিসাবে আসতে থাকে। ষষ্ঠদশ শতকের শেষে মুকুন্দরাম রংরেজদের উল্লেখ করেছেন, যারা সম্ভবত কাপড় রং করত। উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাবার ফলেই যে এই বিভাজন আসছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মোরল্যান্ড মুঘল যুগে উৎপাদনের একটা হিসাব দিয়েছেন সেটা মেনে নেওয়া শক্ত, কারণ উৎপাদনের তথ্য বিরল। কাশিমবাজারে রেশমের উৎপাদনের সংখ্যা বা থাট্টায় তাঁতির সংখ্যা ছাড়া আর কোনো সংখ্যা প্রায় পাওয়াই যায় না। শুধু বলা যায়, বিদেশি বাণিজ্যের উৎসর উপর ভিত্তি করে বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন দ্রুত বাড়ছিল। উৎপাদনের নতুন কেন্দ্রও তৈরি হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে (১৬৩০-৩৩) গুজরাটে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়ে ওখানকার উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে পড়ে যে অবস্থা প্রায় দশ বছরকাল স্থায়ী ছিল বলে বলা হয়। সাময়িকভাবে বাংলা ঐ জায়গা দখল করলেও স্থায়ী কোনো ফল পায়নি। গুজরাট আবার রপ্তানি কেন্দ্র (উৎপাদন কেন্দ্র সমেত) হয়ে ওঠে। ১৬৮০-র দশক থেকে সুরাটের সামনে ইউরোপীয় জলদস্যুদের ক্রমাগত হামলা ও সুরাটের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজার ওলন্দাজদের দখলে চলে গেলে সুরাট অবসন্ন হতে থাকে। ওম প্রকাশ দেখাচ্ছেন যে ১৬৮০-র দশকের পর থেকেই ইউরোপীয় লগ্নি পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূলে সরে আসতে থাকে যার ফলে হুগলী ও পাটনার উত্থান ত্বরান্বিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে মুঘল-মারাঠা যুদ্ধ গুজরাটের পশ্চাদ্‌ভূমিকে অনিশ্চিত করে তোলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে মন্দা আসায় গুজরাটের বাণিজ্যিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। এসবের ফলে বাংলার রপ্তানি গুজরাটকে ছাড়িয়ে যায় এবং রেশম রপ্তানিতে বাংলা প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতে রঙের উৎপাদন বহুদিনের। মুঘল যুগে করমণ্ডল থেকে আসত লাল রং যেটির বেশি ব্যবহার পাওয়া যায় ওখানকার *চিঞ্জ* কাপড়ের মধ্যে। নীল তৈরি হত প্রধানত আগ্রার কাছে বিয়ানাতে এবং গুজরাটের সরখেজে। এদের মধ্যে বিয়ানার রং

ছিল উন্নত মানের। ওলন্দাজরা আগ্রাতে ও বিয়ানাতে বাড়ি রেখেছিল যেখানে দশজন লোক ছিল। সাধারণত বলা হয় যে সুরাটের অবনতির সঙ্গে বিয়ানার ভাগ্য জড়িত ছিল এবং বিয়ানা থেকে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ১৬৬৬ সালের আগে ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার আগ্রাতে এসে দেখেন যে ওলন্দাজরা তাদের বিয়ানার বাড়ি বন্ধ করে দিয়েছে এবং আগ্রাতে মাত্র একজন আছে। এটা পরিষ্কার যে বিয়ানা নীলের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্য বা সুরাটের অবনতির সম্পর্ক নেই। আসলে ওলন্দাজরা আমেদাবাদে এসে বসে ও সরখেজ থেকে নীল কিনতে থাকে। এছাড়াও উত্তর ভারত ও দক্ষিণ করমণ্ডলের কয়েকটা জায়গায় কিছু রং তৈরি হত। সাধারণত কৃষকরাই রং উৎপাদন করত। কখনও কখনও তারা পেশাগত লোকেদের পাতা দিত রং তৈরি করার জন্য। নীলের দাম সবসময়ই ওঠাপড়া করত। গুজরাটের দুর্ভিক্ষর পর নীলের উৎপাদন কমে গিয়েছিল কারণ খাদ্যশস্যর দাম অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

বিভিন্ন জায়গায় আখ থেকে গুড়, চিনি ও মিছরি হত। বাংলাতে সুলতানি যুগ থেকেই কম দামে ভালো চিনি পাওয়া যেত যা রপ্তানি হত চামড়ার থলিতে করে। সপ্তদশ শতকের প্রথমে জেসুইট পাদ্রিদের লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলার পূর্ব উপকূলে পত্তনী হচ্ছে এবং আখের চাষ হচ্ছে। ওদের লেখা থেকে জানা যায় যে উপকূলের জমিদারদের উৎসাহে প্রচুর চিনির উৎপাদন হচ্ছে এবং সারা ভারতে বাণিজ্যর জন্য যাচ্ছে। বাংলা ছাড়া চিনির উৎপাদন হত উড়িষ্যা, মুলতান ও আগ্রা এবং তার চারপাশে। ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি বাংলা থেকে চিনি নিয়ে ইউরোপীয় ও পারস্যের বাজারে বিক্রি করত। ১৬৪০-এর দশকে ওলন্দাজ কোম্পানি বছরে গড়ে সাড়ে চার লক্ষ পাউন্ড চিনি পারস্যে রপ্তানি করেছে। ইংরেজরা চিনি রপ্তানি ধীরে ধীরে কমিয়ে দেয়। সম্ভবত ওয়েস্ট ইন্ডিজের চিনি জায়গা দখল করেছিল।

কৃষি থেকে উৎপাদিত আরো কয়েকটা দ্রব্যর চাহিদা বাড়তে থাকে ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পণ্য হিসাবে চলতে থাকে। এর মধ্যে কয়েকটি দ্রব্যের চাষ অন্যদের তুলনায় বাড়ে। এর মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনের তেল, তামাক, আফিম, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি। উড়িষ্যার উপকূলে একধরনের বীজ থেকে তেল হত যাকে ইউরোপীয়রা বলত *জিঞ্জেলী*। এমনকি উপকূলের ঐ অংশকেও জিঞ্জেলী উপকূল বলে অভিহিত করত। মেদিনীপুরে ফুল ও বীজ থেকে তেল হত। গোয়ালিয়র চামেলী তেলের জন্য বিখ্যাত ছিল।

আকবরের আমলের শেষদিকে পর্তুগিজরা আকবরের দরবারে তামাক নিয়ে আসে যার বর্ণনা রয়েছে। মনে হয় দক্ষিণ ভারতে আগেই এটি প্রচলিত হয়েছিল কারণ দরবারে হাকিম এর বিরুদ্ধে ছিলেন। মুঘল সম্রাটদের বাধা সত্ত্বেও সপ্তদশ শতাব্দীতে

Scanned with CamScanner

তামাকের উৎপাদন বাড়তে থাকে। পর্যটক মানুচ্চি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি লিখেছেন যে দিল্লিতে তামাক থেকে প্রতিদিন শুল্ক পাওয়া যেত পাঁচ হাজার টাকা। প্রধানত দাক্ষিণাত্যের কালো মাটিতে তামাকের চাষ হত বলে বলা হচ্ছে। কিছুকাল পর থেকে গুজরাট, বাংলা ও করমণ্ডল থেকে তামাক রপ্তানি হতে থাকে। অভিজাতদের জীবনযাত্রা বিলাসবহুল হলেও পর্যটকরা দেখেছেন যে গুজরাটে বয়স্কা মহিলারা তামাক সেবন করছেন। অন্য জায়গায় ছোট ছেলেরাও তামাকের ব্যবহার জানে বলে বলেছেন। মালব ও বিহারে আফিম পাওয়া যেত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির কিছু পরিমাণে আফিম রপ্তানি করতে শুরু করে যেটা আনা হত প্রধানত বিহার থেকে। মদ তৈরি করার উপর সময় সময় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলেও মহুয়া, গুড় ইত্যাদি থেকে বহুকাল ধরেই মদ তৈরি করা হচ্ছিল। অভিজাতরা অবশ্য পারস্যের সিরাজের তৈরি *সিরাজী* মদ পছন্দ করতেন। কোম্পানিরা ইউরোপ থেকে মদ আমদানি করলেও বিক্রি করতে পারত না। তবে তারা উপহার দিতে পারত।

মুঘল ভারতে খনিজ দ্রব্যের অভাব ছিল কারণ খনির গভীরে যাবার কৃতকৌশল জানা ছিল না। মোরল্যান্ড অবশ্য অন্য কারণ দিয়েছেন। উনি বলছেন জ্বালানির অভাবই এই কারণ। এসত্ত্বেও লোহার উৎপাদনে ভারত স্বনির্ভর ছিল। বাংলা, এলাহাবাদ, আগ্রা, বেরার, গুজরাট, দিল্লি ও কাশ্মীরে লোহার উৎপাদন হত। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ওলন্দাজরা বাটাভিয়াতে নিয়ে যেত লোহার পেরেক, কামানের গোলা ও লোহার অন্যান্য দ্রব্য করমণ্ডল উপকূল থেকে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসি বণিক মার্তা ইন্দুরে ইস্পাত তৈরির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে ঐ ইস্পাতই দামাস্কাসে যেত তরোয়াল তৈরি করার জন্য। আবুল ফজলও ইন্দুরে ইস্পাত তৈরির কথা বলেছেন। গুজরাট, করমণ্ডল ও বাংলা থেকে সোরা রপ্তানি হত যেটি নিয়ে আসা হত পাটনা থেকে। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপে সোরার চাহিদা খুব বেড়ে যায় ও রপ্তানি বাড়তে থাকে। একটি সমকালীন দলিলে দেখা যাচ্ছে যে ১৬৮৮ সালে পাটনাতে কাঁচা সোরার উৎপাদন ছিল ১,২৬,২০০ মণ। পাটনার সোরা সবথেকে ভালো বলে ধরা হয়েছিল। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে নিজের মধ্যে চুক্তি করে সোরার দাম ঠিক রাখার জন্য। কোনো কোম্পানি কত সোরা নেবে তাও ঠিক করা হয় যেটা ১৭৫৭ সালের পরও অব্যাহত ছিল। এরপর ইংরেজরা অন্য কোম্পানিকে সোরা কেনার অধিকার সঙ্কুচিত করে দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপীয় জলদস্যুদের আক্রমণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আওরঙ্গজেব পাটনা থেকে ইউরোপীয়দের সোরা কেনা বন্ধ করে দেন। ফরাসিরা মুঘল ও আর্মেনিয়ান বণিকদের মাধ্যমে সোরা কিনতে থাকে যদিও এতে অনেক দাম বেশি পড়ে যায়। ১৬৯৩ সালে হুগলি থেকে লেখা একটি ফরাসি চিঠি থেকে জানা যায় যে তারা

পনেরো হাজার বেল সোরা সংগ্রহ করে জাহাজে তুলছে। কিছুকাল পরে অবশ্য নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়।

ফরাসি পর্যটক তাভারনিয়ার ছিলেন হীরের ব্যবসায়ী এবং হীরের বিষয়ে লিখেছেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় এর অবশ্য কোনো গুরুত্ব ছিল না। হীরের সাথে দিনমজুরের সংখ্যা তাভারনিয়ার দিয়েছেন, কিন্তু এত বড় একটা সংখ্যা ছিল কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বিজাপুর ও গোলকুন্ডাতে দুটি খনি ছিল বলে জানা যায়। ছোটনাগপুরের নদীর পাড় থেকে হীরের গুঁড়ো পাওয়া যেত বলে জানা যায়।

নুন ছিল অনেক বেশি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। স্বভাবতই এর আভ্যন্তরীণ বাজার ছিল বিশাল। পাঞ্জাবের পাহাড় ও সম্ভর হ্রদ থেকে এবং সমুদ্র থেকে বিভিন্ন জায়গায় নুন উৎপন্ন হত। নুনের আলাদা ব্যাপারী ছিল যারা বিভিন্ন জায়গায় নুন ফেরি করে বেড়াত। বাংলায় নুন প্রস্তুতকারকদের *মলঙ্গী* বলা হত। মুকুন্দরামের লেখা থেকে জানা যায় যে এরা শহরের বাইরে অস্পৃশ্যদের মত থাকত। কারণ খুব পরিষ্কার নয়— সম্ভবত সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলে এরকম হতে পারে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সোনা প্রায় পাওয়াই যায় না। দক্ষিণ ভারতের সোনার খনি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। রুপোও প্রায় পাওয়াই যায় না। তবে তামা এতটা দুর্লভ ছিল না যদিও তার উৎপাদন খুবই সীমিত। ছোটনাগপুরে, রাজস্থানে ও হিমালয়ের পাদদেশে তামা পাওয়া যেত। সুতরাং এই তিনটি ধাতুই ছিল ভারতে দুর্লভ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে এগুলি পাওয়া যেত।

সৌধ নির্মাণ শিল্পের পরই যাতায়াত শিল্পে সম্ভবত শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল বেশি। এই শিল্পের প্রধান উৎপাদন ছিল বিভিন্ন ধরনের নৌকা। মুঘল চিত্রকলাতে নানান ধরনের নৌকার ছবি পাওয়া যায়। বাংলার মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্য থেকে ফরাসি পণ্ডিত জাঁ দ্যলোচ বাংলায় মধ্যযুগে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের নৌকার কথা বলেছেন যার মধ্যে *ডিঙি* উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকের লেখা *বাহারিস্তান-ই ঘায়েবী*-তে বাংলায় ব্যবহৃত বহু ধরনের নৌকার কথা আছে। আবুল ফজলের লেখা থেকে জানা যায় যে বাংলার উপকূলের জন্য মুঘলরা *নওয়ারা* তৈরি করেছিল যেটি ছিল এক আমীরের অধীনে। এর সমর্থন *বাহারিস্তানে* পাওয়া যায়। এর অধীনে সরকার বিভিন্ন ধরনের নৌকা তৈরি করাত। তাভারনিয়ার বলেছেন যে ঢাকায় নদীর পাড় ধরে মাঝি-মাল্লারা ও নৌকা তৈরি ও সারানোর কারিগররা বসতি করেছিল। খালবিলে ভর্তি ও নদীসমৃদ্ধ বাংলাতে নৌকাই ছিল প্রধান ব্যবস্থা মাল ও লোক যাতায়াতের। ফলে অসংখ্য নৌকার প্রয়োজন ছিল এবং বহু লোক এতে নিযুক্ত ছিল।

বহু শত বছর ধরেই ভারতীয় বণিকরা নিজেদের জাহাজে বাণিজ্য করেছে যার বহু প্রমাণ আছে। কিন্তু কোথায় ঐসব জাহাজ তৈরি হত তার বিশদ বিবরণ পাওয়া

Scanned with CamScanner

যায়নি। মুঘল যুগে আকবর দুটি জাহাজ সিন্ধুতে তৈরি করান এবং প্রথমটি ওলন্দাজদের প্রথামত নদীতে নিয়ে যাওয়া হয় সমুদ্রযাত্রার জন্য। এটি তখুনি ডুবে যায়। পরেরটি সম্ভবত ছোট বলে ভাসে। বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে কেউ কেউ অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম উপকূলে জাহাজ তৈরি করা দেখেছেন। সপ্তদশ শতকে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের সময়ে ইংরেজরা দুটি ভারতীয় জাহাজ পায় ও তার বর্ণনা প্রতিবেদনে পাঠায়। এতে দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপীয় জাহাজের মতই এগুলি ছিল। অবশ্য বড় ভারতীয় জাহাজের কথা পাওয়া যায় যেগুলি হজ তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যেত। কিন্তু এদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুবই খারাপ। ফলে ইউরোপীয় জলদস্যুরা সহজেই এগুলি দখল করতে সমর্থ হত।

ভারতীয় জাহাজ তৈরি হত কাঠের পাটাতনের উপর পাটাতন জুড়ে ও দড়ি দিয়ে বেঁধে। এগুলি টিকত বহুদিন এবং সাধারণত এতে লোহার পেরেক লাগানো হত না। ইউরোপীয় জাহাজের পাটাতনে লোহার গজাল বা পেরেক লাগিয়ে তার উপর পিচ ঢালা হত। প্রতিবার সমুদ্রযাত্রার পর আবার পিচ ঢালতে হত। ষষ্ঠদশ শতকের শেষের লেখক মুকুন্দরাম জাহাজ তৈরির বর্ণনা দিয়েছেন। টনেজ না দেওয়ায় জাহাজটির চরিত্র নির্ধারণ করা শক্ত, কিন্তু লম্বায় একশো গজ ও চওড়ায় বিশ গজ বলে উনি একে ছোট ইউরোপীয় জাহাজের সমকক্ষ করে তুলেছেন। যেটা উল্লেখযোগ্য যে উনি *গজাল* ব্যবহারের কথা বলেছেন, যদিও বলেননি যে ওগুলো লোহার কিনা। লোহার ব্যবহার ভারতে বহুদিনের এবং এর গজাল বা বড় পেরেক ব্যবহার করা আশ্চর্য নয়। অন্য কোনো সূত্রে অবশ্য ভারতীয় জাহাজে লোহার ব্যবহারের কথা পাওয়া যায় না। মুকুন্দরাম একে *ডিঙি* বলছেন যেটি ছোট জাহাজের সমকক্ষ।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে প্রধানত কাঠের যোগান আছে, এরকম জায়গাতেই নৌকা বা জাহাজ তৈরির শিল্প গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম উপকূলের কাঠ জাহাজের পক্ষে উপযুক্ত থাকায় সুরাট জাহাজ তৈরির জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে বোম্বাই ধীরে ধীরে এই জায়গা দখল করে নিতে থাকে ও ভারতীয় জাহাজি বণিকদের ভাগ্য পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। ফরাসিরা ক্রমশ ইউরোপীয় ধাঁচের জাহাজ তৈরি করতে শুরু করে। অবশ্য পর্তুগিজরা আগেই এই ধরনের জাহাজ তৈরি করে চড়া দামে বিক্রি করত। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ওলন্দাজরা করমণ্ডলে ইউরোপীয় ধরনের জাহাজ তৈরি করে বিক্রি করতে শুরু করে। কিন্তু তার দাম অত্যন্ত বেশি হয়ে যাওয়ায় কিছুকাল পরে তারা ঐ কাজ বন্ধ করে দেয়। সাধারণত মসুলিপত্তনমের অদূরে নরসপুরে জাহাজ ও নৌকা তৈরি হত।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বাংলায় ওলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে ফরাসিরা বাংলা থেকে নৌকা ও বড় লোহার নোঙর সংগ্রহ করতে পারছিল না, যদিও তারা জানায়

যে সুরাট ও করমণ্ডলে এগুলি সহজলভ্য। সমকালীন ইংরেজদের লেখা চিঠি থেকে জানা যায় যে খাম্বাজ শহরে জাহাজ তৈরি হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও। ওরা ঐ জাহাজ তৈরির কারখানা পরিদর্শন করেন। এসব থেকে পরিষ্কার যে ভারতে জাহাজ তৈরির মান ছিল উঁচু ও কারিগরের অভাব ছিল না। ঢাকার নদীর ধারে ছোট জাহাজ তৈরির কথা কোনো কোনো পর্যটক বলেছেন।

ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের চাহিদার জন্য বহু ধরনের দ্রব্যের প্রয়োজন হচ্ছিল। এদের মধ্যে ছিল আসবাবপত্র, তৈজসপত্র বিশেষত ধাতুর, চামড়ার দ্রব্য, দর্জির তৈরি জামাকাপড়, জুতো, লেখার সরঞ্জাম, কাগজ, সুগন্ধি, গহনা, ঘোড়ার সরঞ্জাম, বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। আকবরের প্রাসাদে যে এসব ব্যবহৃত হত তার বর্ণনা আবুল ফজল *আইন-ই আকবরী*-তে দিয়েছেন। প্রাসাদের ব্যবহৃত দ্রব্য আসত সম্রাটের কারখানা থেকে যার বর্ণনা ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার দিয়েছেন। এছাড়া কারখানার কাজকর্মের কথা সমকালীন ফার্সী সাহিত্যেও পাওয়া যায়।

যেটা দেখা যায় যে দরবারি চাহিদা ও উৎপাদন ছাড়া এই সব দ্রব্যের বিশাল বাজার সারা সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে কোনো কোনো জায়গা কয়েকটি পণ্যের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। কাশ্মীরে শাল ও কাঠের কাজ, গুজরাটে কাঠ, লাক্ষা ও কর্নেলিয়ান ও অন্যান্য পাথরের কাজ, লাহোর ও মুলতানে চামড়ার কাজ যার মধ্যে জুতো ছিল, পাটনায় সুগন্ধী বাসন, এলাহাবাদের কাছে শাহজাহানপুরে কাগজ তৈরি মুঘল যুগে নাম করেছিল। বাংলাতেও কাগজ তৈরি হত কারণ মুকুন্দরাম *কাগজী* নামে পেশাদার কারিগরদের কথা বলেছেন। সপ্তগ্রামে কাগজীপাড়ার উল্লেখ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেও পাওয়া যায়। এটা পরিষ্কার যে নানান ধরনের দ্রব্যর জন্য বিভিন্ন পেশার কারিগরের প্রয়োজন হচ্ছিল যার ফলে কারিগরদের মধ্যে বিশেষ ধরনের কাজ করার ঝোঁক আসে ও অবস্থা স্থিতিশীল হলে ঐ পেশার কারিগররা বিশেষ জাতে পরিণত হয়। অভিজাতরা সম্রাটের জীবনযাত্রা অনুকরণ করার ফলে বিলাসদ্রব্যের চাহিদা বাড়তে থাকে। আগে বলা হয়েছে যে বার্নিয়ার উল্লেখ করেছেন যে মনসবদাররা চাবুক (*কোড়া*) মেরে কারিগরদের দিয়ে সম্ভবত বিনা পারিশ্রমিকে বা অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করাচ্ছে। ভারতের কুটির শিল্পের বিশাল বাজারে পণ্যের সমারোহের কথা দেখলে বার্নিয়ারের এই উক্তি মানা যায় না।

সমকালীন জগতে ভারতের কারিগরি শিল্প বিস্ময় উৎপাদন করলেও, কারিগরী জগতের স্থায়ী সীমাবদ্ধতা ছিল। বাজারী উৎপাদন করা হত পরম্পরাগত প্রথায় যার ফলে পণ্য উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তন প্রায় হয়নি। একই ধরনের পণ্য চিরাচরিতভাবে বাজারে বিক্রি হত। বিশেষ জাতের কারিগর বিশেষ ধরনের পণ্য বা তার অংশ উৎপাদন করত যার উন্নতির জন্য কোনো চেষ্টা করা হয়নি। কারিগরের যন্ত্রও ছিল

Scanned with CamScanner

সাবেকি প্রথার যার জন্য লগ্নির প্রায় কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কারিগরও যন্ত্রের উন্নতির কোনো চেষ্টা করেনি, কারণ বাজারের চাহিদা তাকে ঐ দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে সাহায্য করেনি।

এই অপরিবর্তিত উৎপাদন প্রথার পিছনে আর একটি কারণ ছিল। অধিকাংশ পণ্যই কারিগর তৈরি করে বিক্রি করছে। অর্থাৎ লগ্নিকারক ও কারিগর একই লোক। সাধারণত কারিগরদের অবস্থা খারাপ থাকায় হয় তারা ধারে কাঁচামাল নিচ্ছে, নয়ত বণিকের কাছ থেকে টাকা ও মাল নিয়ে নির্দেশমত কাজ করছে। বণিকরা লগ্নি করলেও কারিগরের যন্ত্রের উন্নতির জন্য কোনো তাগিদ দেখায়নি। অর্থাৎ তার লগ্নি কেবল বণিকের লগ্নি (Merchant Capital) যেটা শুধু উৎপাদন নেবার অপেক্ষায় আছে। যন্ত্রের উন্নতি হলে বা উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করে একই ধরনের উৎপাদন আরও বেশি করে করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে তারা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন।

এসবের ফলে সামান্য লগ্নি করে বা না করে কারিগর বিত্তশালী হয়ে ওঠেনি। ইউরোপে বা চিনদেশে কারিগর বিত্তশালী হয়ে কারখানা তৈরি করে আরও কারিগরকে কাজে লাগাচ্ছে এই ছবি ভারতে বিরল। এছাড়াও ভারতের উৎপাদনের সামাজিক ব্যবস্থার ফলে কারিগরের বিত্তশালী হয়ে ওঠা ছিল প্রায় অসম্ভব। ভারতে উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল পরিবারভিত্তিক এবং পরিবারের সকলেই প্রায় উৎপাদনে অংশগ্রহণ করত। বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন পরিবারের কর্তা এবং তাঁরই নির্দেশে কাজ হত। ফলে আয়ও পরিবারের মধ্যে ভাগ হয়ে যেত যার ফলে কারুর হাতেই বিশেষ আয় থাকত না। এই ব্যবস্থার ফলে দক্ষ কারিগরের পক্ষে অন্য কোনো পেশা গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল এবং উৎপাদনের জায়গাতে পরিবর্তন করতে চাইত না। বহুকালের জাতিভেদ প্রথা, বর্ণাশ্রম ইত্যাদির ফলে কারিগরী জগতে গতিশীলতা প্রায় ছিলই না, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া।

কারিগরী উৎপাদনের একটা অংশ ছিল গ্রামীণ বাজারের জন্য যার দুটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। একটি ছিল পরম্পরাগত পণ্যের চাহিদা ও অন্যটি ছিল কম দামের পণ্য। ফলে এখানেও কারিগরদের মধ্যে কোনো উৎসাহ ছিল না উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করার। যুগ যুগ ধরে সামাজিক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার মধ্যে কারিগরি উৎপাদন চলছিল এবং ঐ বৈষম্য কারিগরদের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে দেখা যায়। মুকুন্দরাম যে মলঙ্গীদের শহরের বাইরে রেখেছিলেন এর উল্লেখ আগেই করা হয়েছে যদিও কারণ খুব স্পষ্ট নয়। যেখানে বণিকের সমুদ্রযাত্রার বিশদ বর্ণনা আছে সেখানে এরা সমুদ্রদোষে দুষ্ট বলে মনে হয় না। সম্ভবত এরা ছিল দলিত।

বিভিন্ন পেশার কাজ বিভিন্ন জাতের কারিগররা করত। আবদুর রহিম খান-ই খানানের কবিতায় বা *অর্ধকথানকে* বিভিন্ন জাতের কারিগরের কথা বলা হয়েছে। এর

মধ্যে কতকগুলি পেশা মুঘল যুগেই শুরু হয়েছিল। এদের মধ্যে ধুনুরীর আবির্ভাবের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। বিভিন্ন রকম কাপড় তৈরি করার মধ্যে বিভিন্ন পেশার ও জাতের কারিগরদের কথা পাওয়া যায়। খাম্বাজের কাছে রতনপুরা পাহাড় থেকে পাথর কেটে এনে কর্নেলিয়াম ও অন্যান্য পাথরের টুকরো করা হত যার জন্য তেরোটি জাতের কারিগর ছিল। এদের প্রত্যেকের আলাদা পঞ্চায়েত ছিল যাকে ইউরোপীয়রা 'গিল্ড' বলে অভিহিত করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত খাম্বাজে এই ধরনের পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

আগেই দেখা হয়েছে যে কারিগরদের সামাজিক অবস্থা গোটা সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত যার ফলে নিচুস্তর থেকে কারিগরদের উঁচুস্তরে যাওয়া বা পেশা বদলানো সম্ভব ছিল না। সমাজব্যবস্থা ঈশ্বরদত্ত বলে ব্যাখ্যা দেওয়ার ফলে ব্যবস্থার বদলের সম্ভাবনা কারিগর খুঁজে পায়নি। মুঘল শাসকশ্রেণী জাতপাতের মধ্যে হাত দেয়নি এবং কারিগরকে মুক্ত করার কোনো চেষ্টা করেনি। বরঞ্চ ঐ ব্যবস্থা যাতে চলতে থাকে সেটি সুনিশ্চিত করেছিল। উঁচু জাতের লোকেরা বা অভিজাতরা উৎপাদন পদ্ধতি বদলানোর চেষ্টা করেনি যদিও সপ্তদশ শতকের শেষদিকের একটি ফার্সী প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে বহু অভিজাত লোক রেখে বাণিজ্য করছে। ফলে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগে ভারতের গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে কারিগরী উৎপাদনের একটা সম্পর্ক ছিল। ইউরোপে দেখা যায় যে গ্রামীণ কাঁচামাল শহরে আসছে উৎপাদনের জন্য। ভারতে এরকম পরিষ্কার ছবি অল্পই পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গ্রামীণ কাঁচামাল গ্রামের মধ্যে বা কাছাকাছি ছোট শহরে বা বাজার-শহরে পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে বড় শহরের বাজারে বিক্রির জন্য আসছে। গুজরাটে খাম্বাজের সংলগ্ন এলাকায় তুলো তৈরি করে খাম্বাজে এনে জামা বা চাদর তৈরি করার প্রথা বহুদিনের যারপর ওখান থেকে বিদেশে রপ্তানি হত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মারাঠারা কতকগুলি ছোট বাজার-শহরে এগুলি করতে থাকে যার ফলে খাম্বাজের শুল্কের আয় কমে যায়।

মহিলাদের কারিগরী কাজ করা নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা আছে কারণ তথ্য বিশেষ নেই। ষষ্ঠদশ শতকের শেষে মুকুন্দরাম বলেছেন যে মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে মহিলারা সুতো কাটছে প্রধানত পরিবারকে সাহায্য করার জন্য। ইউরোপীয় পর্যটকরা দেখেছেন যে পরিবারের মেয়েরা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাপড় রং করার কাজে হাত লাগিয়েছে। বর্তমানকালের ঐতিহাসিক আবদুল করিম দেখিয়েছেন যে ঢাকাতে মসলিন কাপড় তৈরির একটা বড় কাজ মেয়েরা করছে। মধ্যযুগে

Scanned with CamScanner

কারিগরের বাসস্থানই যে তার কারখানা এবং তার পরিবার সক্রিয়ভাবে উৎপাদনে অংশ নিচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রাচীন গ্রামীণ প্রথা মেনে গ্রামীণ উৎপাদন গ্রামের বিভিন্ন লোকেদের মধ্যে তাদের কাজের বিনিময়ে বিতরণ করা হত। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ প্রথা যে মহারাষ্ট্রে চলছিল তার প্রমাণ আছে। পক্ষান্তরে মহারাষ্ট্রে ও দাক্ষিণাত্যে পাওয়া যায় সারা বছর কাজ করার বিনিময়ে গ্রামের জমির ফসলের একটা অংশ দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে অবশ্য কারিগর ছাড়া পুরোহিত, হিসাবরক্ষক, চৌকিদার ইত্যাদি ধরনের লোক ছিল। প্রাচীন *যজমানী* প্রথা ছিল এর থেকে কিছুটা ভিন্ন। এটি উত্তর ভারতের কিছু অংশে পাওয়া গেলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্যন্ত ছিল মহারাষ্ট্র ও বাংলাতে। গ্রামের পুরোহিত বিভিন্ন বাড়িতে পুজো বা অন্যান্য ধর্মীয় কাজ করতেন তার বদলে খাদ্যদ্রব্য, কাপড় ইত্যাদি পেতেন। সরাসরি অর্থ দেবার রেওয়াজ ছিল না। বাংলাতে মুকুন্দরাম এই প্রথার বিশদ বর্ণনা করেছেন। ততদিনে অবশ্য বাজারী অর্থনীতি চালু হয়ে গিয়েছে এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে কাজ চলছে। অর্থাৎ দুটি অর্থনীতিই একই জায়গায় সমান্তরালভাবে চলছে তার বর্ণনা আমরা মুকুন্দরামের লেখাতে পাই। এই গ্রামীণ ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও কারিগররা ক্রমবর্ধমান বাজারের চাহিদা মেটাচ্ছে। আকবরের বকশী নিজামুদ্দিন ৩২০০ কসবা বা বাজার-শহরের কথা বলেছেন। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীতে কারিগররা 'মুক্ত' থাকলেও এবং বাজারের জন্য উৎপাদন করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অবস্থা বদলে যেতে থাকে। মুঘলদের কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে এলে, অভিজাতদের চাপ বেড়ে যায় কৃষক ও কারিগরদের উপর। এর ফলে গ্রামীণ ব্যবস্থা ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়তে থাকে।

কৃষকদের উৎপাদন তাদের গ্রাসাচ্ছাদন ও খাজানা দেওয়াতেই প্রায় শেষ হয়ে যেত। কিন্তু বহু কৃষক অবসরে অন্য কাজও করত। এগুলির মধ্যে ছিল আখ থেকে চিনি তৈরি করা, নীল তৈরি করা, নানা ধরনের রং, কাঁচা রেশম উৎপাদন করা ইত্যাদি। রেশমের কাপড় অন্যরা তৈরি করলেও তুঁত থেকে কাঁচা রেশম তৈরি করা ছিল কৃষকদের কাজ। পরবর্তীকালে কাজের বিভাজনের ভিত্তিতে পেশা ও জাত তৈরি হতে থাকে। প্রথমদিকে কৃষকরা নুন ও সোরা তৈরি করত যেগুলি ছিল তাদের আধা-সময়ের কাজ। পরবর্তীকালে *মলঙ্গী* নামে পেশাদার নুন প্রস্তুতকারক তৈরি হয় যাদের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হ্যামিলটন বুখানন বিহারে *লোহারু*-দের কথা বলেছেন যার থেকে মনে হয় যে এরা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই আলাদা পেশা বেছে নিয়েছিল। এটাও বোঝা যায় যে বাজারী অর্থনীতি ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে কৃষক ও কারিগর বাজারের জন্য নতুন পণ্য উৎপাদন করতে দ্বিধা করেনি। সাধারণত বলা হয় যে ভারতীয় কারিগররা অত্যন্ত গোঁড়া ও গতিশীল নয়

অর্থাৎ এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গাতে যেতে চায় না। দ্বিতীয়টি মেনে নেওয়া সহজ কারণ তার প্রমাণ আছে। কিন্তু প্রথমটি মেনে নেওয়া যায় না। একমাত্র ঘড়ি ছাড়া প্রায় আর সব নতুন পণ্য উৎপাদন করতে তারা দ্বিধা করেনি।

বাজারী অর্থনীতি ও দূরপাল্লার বাণিজ্যের চাহিদা বাড়লে উৎপাদনও বেড়ে যেতে থাকে। এর থেকে এই ধারণা হওয়া সম্ভব যে কারিগররা পরম্পরাগত *যজমানী* প্রথা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বা প্রাচীন গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন আসছে। এ সম্বন্ধে তথ্য অবশ্য বিশেষ নেই। যেটা দেখা যায়, বিশেষত সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ও প্রধানত ইউরোপীয় কোম্পানির কাগজপত্র থেকে, যে অধিকাংশ কারিগরই আগাম দাদনের উপর নির্ভরশীল। প্রধানত এই দাদন দেওয়া হত নগদ টাকায় এবং দালাল বা বণিকরা এটি দিয়ে উৎপাদন নিজেদের জন্য সুরক্ষিত করে রাখত। অনেক সময়ে মালেও দাদন দেওয়া হত। শস্য আগাম দেওয়ার কথাও বিরল নয়।

সারা শতাব্দী ধরে যে কারিগর ও তার উৎপাদন অপরিবর্তিতভাবে চলছিল এটা মনে করার কারণ নেই। ১৬৭৭ সালে ইংরেজরা মসুলিপত্তনম শহর সম্বন্ধে লিখছে যে আগে এখানে এত বণিক ছিল যে বিভিন্ন ধরনের ক্যালিকো দু-তিন দিনের মধ্যে পাওয়া যেত। এখন বণিকের সংখ্যা এত কমে গিয়েছে যে দু-তিন মাস আগে দাদন দিতে হয়। যেটা ইংরেজরা বলেনি সেটা হচ্ছে যে ওলন্দাজদের অত্যাচারে বণিকরা ঐ শহর ছেড়ে পালিয়েছে যার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

দাদন দেওয়ার প্রধান কারণ যে কারিগরদের হাতে কাঁচামাল কেনার মতো টাকা নেই, অর্থাৎ তার কোনো লগ্নি নেই। এটাই প্রায় সারা ভারতের ছবি। ১৭০০ সালে ফরাসি কোম্পানি হুগলিতে সরাসরি তাঁতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কম দামে কাপড় কেনার জন্য। কিন্তু তারা দেখে যে তাঁতিরা এত দরিদ্র যে দাদন না দিলে তারা কাজ শুরু করতে পারবে না। বণিকও চাইত দাদন দিতে। একবার দাদন নিলে তাঁতি যে শুধু তার উৎপাদন বণিকের কাছে বন্ধক রাখবে তাই নয়, কম দামও নেবে, যার ফলে বণিকের আয় বাড়বে। তাঁতিদের অবশ্য দাদন নেবার অন্য কারণও ছিল। তাঁতিরা সহজে তাঁত বদলাতে চাইত না এবং দাদন নিলে তারা নিশ্চিন্ত হত যে তার উৎপাদন ফেরত আসবে না।

কিন্তু দাদনব্যবস্থার মধ্যেও পরিবর্তন আসছিল। কোম্পানি ও বণিকরা দাদনের সঙ্গে দিনমজুরিও দিতে থাকে যাতে সময়মত উৎপাদন সম্ভব হয়। করমণ্ডল উপকূলে ইরেজ কোম্পানির এক প্রধান বণিক কাশী ভিরেনা তাঁতিদের দিনমজুরি দিয়ে কাজ করাতেন। তার সঙ্গে দাদন হিসাবে মাল দেওয়া হত। কাশিমবাজারে কোম্পানির কুঠিয়ালরা দিনমজুরি ও দাদন দিয়ে রেশমের কাজ করাতেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও

Scanned with CamScanner

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্যন্ত বহু কারিগর ছিল স্বাধীন। ১৭৯০ সাল পর্যন্ত বাংলার কারিগররা নিজেরাই সুতো কিনে কাজ করেছে। কেবল যেখানে কাঁচামাল দুষ্প্রাপ্য হয়েছে বা বহুদূর থেকে আনাতে হয়েছে সেখানে তারা বণিকদের উপর নির্ভরশীল ছিল। এতে অবশ্য বণিকরা কারিগরের উপর অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তবে অনেক জায়গায় কারিগররা পঞ্চায়েত (গিল্ড) করে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করার চেষ্টা করেছে। গুজরাটে পাথরের শিল্পের কারিগরদের পঞ্চায়েতের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও খাম্বাজে হাতির দাঁতের কারিগরদের পঞ্চায়েত ছিল যার কথা সমকালীন ইংরেজ কোম্পানির কাগজপত্রে পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইউরোপীয় কোম্পানির বণিকরা প্রধানত গুজরাটে ঘুরে ঘুরে মাল সংগ্রহ করে সুরাটে তাদের কুঠিতে পাঠাতেন। ক্রমশ তাঁরা বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রে বা তার কাছে সংগৃহীত কেন্দ্রে ছোট কুঠি বসাতে শুরু করে। এগুলির অধীনে তৈরি হয় *আওরং* বা কারখানা জাতীয় কেন্দ্র যেখানে কোম্পানির লোকেরা কারিগর নিযুক্ত করে কাঁচামালকে পণ্যে রূপান্তরিত করতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি *আওরং* প্রথা জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। শুধু কাশিমবাজারেই তিনটি ইউরোপীয় কোম্পানি প্রায় ১৬০০ রেশমের কারিগর নিযুক্ত করেছিল। বলা হয় যে ঐ অঞ্চলে ঐধরনের কারিগরের সংখ্যা আড়াই হাজারের উপরে ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে মসুলিপত্তনমে ও বারাণসীতে প্রায় সাত হাজার তাঁতি ও কাপড়ের আনুষঙ্গিক কারিগর বাস করত বলে জানা যায়। বলা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রায় সব ছোট শহরেই কাপড়ের কারিগরদের বসতি ছিল। কাপড়ের দামের পরিবর্তন এর ফলে হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

স্বভাবতই কারিগররা বাজার-শহরের চারপাশে বসতি স্থাপন করতে চাইত বিশেষত যদি ঐ শহরগুলি রপ্তানি বন্দরের কাছে হয়। কলকাতা বা মাদ্রাজে উচ্চবিত্তদের প্রভাব থাকায় কারিগররা আসতে চাইত। এদের তুলনায় বোম্বাইতে কারিগররা আসতে সময় নিয়েছে যার পিছনে নানা ধরনের কারণ আছে। সুরাট ও খাম্বাজের শহরতলির কারিগররা বহুদিন পর্যন্ত বোম্বাইতে যেতে চায়নি। সুরাটের বণিকরা বোম্বাই গেলে, সংশ্লিষ্ট কারিগররা তখন যেতে রাজি হয়। খাম্বাজ শহরের প্রধানত আরব বণিকরা মারাঠা অঞ্চলে চলে যেতে থাকে যার ফলে কারিগররাও ওদের সঙ্গে যায়। এর পরেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কারিগররা খাম্বাজের শহরতলিতে বাস করত। এদের মধ্যে ছিল পাথরের ও কাপড়ের কারিগর যাদের উৎপাদনের কাঁচামাল আসত খাম্বাজের পটভূমি থেকে এবং উৎপাদিত পণ্য চালান যেত সুরাট বা বোম্বাই বন্দরে রপ্তানির জন্য। কারিগরদের না যাবার একটা কারণ হয়ত ছিল কাঁচামালের সহজলভ্যতা।

চারপাশে নীল পাওয়া যেত বলে আগ্রা বা আমেদাবাদে সারা দেশ থেকে কাপড় যেত। ভারুচ একসময়ে তার জলের জন্য বিখ্যাত ছিল ও বিভিন্ন জায়গার কাপড় পরিষ্কার করার জন্য নিয়ে আসা হত। সুরাট বা আমেদাবাদে প্রচুর সংখ্যায় রেশমের কারিগর পাওয়া যেত যদিও তার কারণ খুব পরিষ্কার নয়। ঐ রেশম আসত বাংলা থেকে। বাংলাতে তখন কেন রেশমের কাপড় তৈরি হত না বলা যায় না। সম্ভবত ইউরোপীয়রা কাঁচা রেশম রপ্তানি করতে চাইত বলে জোর তার উপর ছিল। কারিগররা তাদের পরিচিত বাসস্থান পরিবর্তন করতে চাইত না। ইংরেজ কোম্পানি একবার বাংলা থেকে মাদ্রাজে কিছু কারিগর নিয়ে যেতে চাইলে কারিগররা আপত্তি করে। সুতরাং মুঘল-ভারতে আমরা ইউরোপীয়দের মত গতিশীলতা ও সমাজ-বিন্যাস দেখতে পাই না। এখানে পরম্পরা ভাঙা হয়নি এমন নয়, কিন্তু তার উদাহরণ বিরল।

সমকালীন চিনদেশে রেশমের কারিগরদের বিভিন্ন স্তর-বিন্যাস ও বিত্তশালী কর্তার কথা পাওয়া যায়। মুঘল-ভারতে এ ছবি বিরল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার কারিগররা উৎপাদন করছে ও পণ্য বিক্রিও করছে, যে ধরনের ব্যবস্থা বাজারী অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত ও বাংলাতে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষে লখনৌতে এরকম কর্তার দেখা পাওয়া যায় যার অধীনে কারিগররা দিনমজুর হিসাবে কাজ করছে। বলা বাহুল্য এই ধরনের কর্তার হাতে অর্থ আছে। এটা মনে করা অসঙ্গত হবে না যে বাজার বেড়ে ওঠার ফলে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এই ধরনের লোকদের আবির্ভাব ঘটেছে। গুজরাটেও জাহাজ তৈরির কাজে দিনমজুরের সাহায্যে পার্শী কর্তা কাজ করতেন। সম্ভবত ইউরোপীয় ধাঁচে জাহাজ তৈরির চাহিদা বাড়ছিল যেটা পূরণ করতে পার্শী ধনী বণিকরা এগিয়ে আসে।

স্বাধীন বাজারী কারিগরদের আয় কত ছিল এবং তাদের জীবনযাত্রার মান কিরকম ছিল বলা শক্ত। আবুল ফজল *আইনে* শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির হিসাব দিয়েছেন। অদক্ষ শ্রমিকের দিনমজুরি ছিল দুই দাম থেকে সাত দামের মধ্যে। অবশ্য এই রোজগার নির্ভর করছে শ্রমিকের দক্ষতার উপর। যেমন আবুল ফজল বলছেন যে পাঁচ শ্রেণীর ছুতোর ছিল যাদের দিনমজুরি ছিল দুই দাম (তামার মুদ্রা) থেকে সাত দামের মধ্যে। আবুল ফজল আরও বলছেন যে জহুরী, স্বর্ণকার, ধাতুর কারিগর, মুক্তোর কারিগর, মুদ্রাতে লেখনীকার ইত্যাদিরা অনেক বেশি রোজগার করত—কেউ কেউ দিনে কুড়ি দাম পর্যন্ত পেত। ইরফান হাবিব হিসাব করে দেখিয়েছেন যে অদক্ষ শ্রমিকরা গমের রুটি, ডাল, এমনকি দুধ ও দই খেতে পারত। দিল্লিতে গরিবরা যে ঘি খেত সেকথা বিদেশী পর্যটকরা বলেছেন। এই রোজগারে অবশ্য টাকা জমানো সম্ভব নয়—ফলে লগ্নি করার মত পুঁজি কারিগরদের ছিল না কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন চলে

Scanned with CamScanner

যেত। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ও অভিজাতদের শিল্প-উৎপাদনে লগ্নি না করার ফলে মুঘল ভারতের কারিগরদের ইউরোপের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

শক্তিশালী রাষ্ট্র বণিকদের জগতে যেমন হস্তক্ষেপ করেনি, তেমনি কারিগরদের অবস্থা সম্পর্কেও ছিল উদাসীন যতদিন না তারা বিদ্রোহ করে ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়। কিন্তু কারিগরদের প্রতিবাদ হয়নি এরকম নয়। ১৬৩০ সালে ভারুচ শহরের কারিগররা ইংরেজদের সুতো কেনার একচেটিয়া মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৬৮০ সালে ইংরেজরা মাদ্রাজে একটা নতুন কর বসালে কারিগররা প্রতিবাদ করে। কারিগররা আঞ্চলিক শাসনকর্তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করে। শাসনকর্তার অত্যাচারের প্রতিবাদে বরোদার কারিগররা শহর ছেড়ে চলে যায়। ১৬৮৪-৮৫ সালে ভারুচের আশেপাশের কৃষক ও কারিগররা শহর দখল করলে সৈন্য নামিয়ে ঐ বিদ্রোহ দমন করতে হয়। কোনো কোনো সময়ে শাসনকর্তারা কারিগরদের পক্ষ নিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুরাটে পর্তুগিজ পাদ্রিরা ছাপাখানার যন্ত্র বসালে লেখনীকাররা প্রতিবাদ করে ও শাসনকর্তা ছাপাখানা বন্ধ করে দেন। কিন্তু এগুলি সবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এসবের থেকে সাধারণ কারিগরদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি।

মুঘল যুগে, এমনকি সুলতানি যুগেও, সরকারি কারখানা ছিল বড় একটা সংস্থা যেখানে বহু দিনমজুর কাজ করত এবং যেটি ছিল পরিবারভিত্তিক বাজারী উৎপাদন ব্যবস্থার থেকে পৃথক। অবশ্য সরকারী কারখানার উৎপাদন ছিল কেবল রাজপ্রাসাদের লোকেদের জন্য এবং এর পণ্য বাজারে বিক্রি করার প্রশ্ন ছিল না। ফলে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল না। এর পণ্য উৎপাদনের জন্য খরচের হিসাব অন্যভাবে করা হত। বড় বড় অভিজাতরাও এই ধরনের কারখানা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল ভারতে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি যে বড় বড় সংস্থা তৈরি করে সেগুলি ছিল অনন্য এবং সরকারী কারখানার থেকে ওদের মৌলিক পার্থক্য ছিল। এই ধরনের সব থেকে বড় সংস্থা ছিল কাশিমবাজারে ওলন্দাজদের কুঠি যেখানে সাত-আটশো কারিগর কাজ করত। এই ধরনের বড় সংস্থা তৈরির উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির নির্দেশমত একই মানের পণ্য উৎপাদন করা এবং কম খরচে বহুপণ্য উৎপাদন করা যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিরা পিছিয়ে পড়ে। ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবারভিত্তিক হওয়ায় ভারতীয়রা এই ধরনের বড় সংস্থা তৈরি করতে আগ্রহী ছিল না। ইউরোপীয় জাহাজের চাহিদা বাড়ার পরেও পার্শী জাহাজি মালিকরা এই ধরনের বড় সংস্থা তৈরি করেনি।

ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি ভারতীয় পণ্যর মান উন্নত করার দিকে সচেষ্ট ছিল, কারণ ইউরোপীয় বাজারে টিকে থাকতে গেলে এর প্রয়োজন। হুগলি, পিপলী ও আমেদাবাদে সোরা শুদ্ধ করার জন্য ইউরোপীয়রা ইউরোপ থেকে তামার পাত্র নিয়ে

এসেছিল। উন্নত মানের রেশম চাষের জন্যও ইউরোপীয়রা বাইরে থেকে অভিজ্ঞ লোক নিয়ে এসেছিল ভারতীয় কারিগরদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য। গুজরাটে উন্নত মানের নীল তৈরির জন্যও ইউরোপীয়রা চিন্তাভাবনা করছিল। সুতরাং একদিকে বড় সংস্থা তৈরি করে দিনমজুর দিয়ে কাজ করানো ও অন্যদিকে উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন করার প্রচেষ্টা একই উদ্দেশ্য করা হয়েছিল। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে বড় সংস্থা না করেও দিনমজুর লাগানো হত। বাংলাতে আর্মেনিয়ানরা দিনমজুর ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। দিনমজুর দিয়ে বড় সংস্থা চালানো ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বড় সংস্থা তৈরি করা ছাড়াও উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে ছোটখাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এর ফলে পুরনো প্রথার অবসান হয়নি বা সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়নি, যদিও পরিবর্তনগুলি মৌলিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সোরা শুদ্ধ করার পদ্ধতি বা উন্নত মানের রেশম চাষের পদ্ধতি এই মৌলিক পরিবর্তন আনেনি। বরং দাদনী প্রথার প্রসার অথবা বিশেষ জায়গায় বিশেষ ধরনের উৎপাদন এই পরিবর্তনের সূচনা করেছে। নতুন প্রয়োগবিদ্যা বা কৃৎকৌশল সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনেনি। বরঞ্চ বাজারী অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে দেশের অর্থনীতিতে একটা জোয়ার আসে যার ফলে উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন। পরম্পরাগত পরিবারভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এই চাহিদা পূরণ করতে ক্রমশ অপারগ হয়ে পড়ে।

ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে লাভ জমতে থাকে ও লগ্নি করার মতো পুঁজিও বাড়তে থাকে। শিল্পবিপ্লবের আগে ইংল্যান্ডে পুঁজির হার ছিল শতকরা একভাগ, যেটা শিল্পবিপ্লবের পর শতকরা দুই থেকে শতকরা পনেরো ভাগের মধ্যে ওঠানামা করতে থাকে। মুঘল যুগে এ ধরনের তথ্য পাওয়া যায় না। সেখানে মুঘল রাজস্বের বড় একটা অংশ ছিল মুষ্টিমেয় অভিজাতদের হাতে যারা বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় ঐ জমা পুঁজি করতে দেয়নি। বিত্তশালী বণিক বা ধনী অভিজাত উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন অংশ নেয়নি। বণিকদের জমার অধিকাংশই চলে গিয়েছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যার ফলে ঐ জমা পুঁজি হয়ে উৎপাদনে আসেনি। এ প্রসঙ্গে মোরল্যান্ড বলেছেন যে উচ্চবিত্তরা হয় সোনা-রূপার গহনা গড়িয়েছে নয়ত মাটির তলায় টাকাটা পুঁতে রেখেছে। সম্রাটদেরও মনোভাব ঐ ধরনের ছিল। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার বলছেন যে মুঘল সম্রাটের আয় (শাহজাহানের সময়) তুর্কির সুলতান ও ইরানের শাহ-র সম্মিলিত আয়ের থেকে বেশি ছিল। কিন্তু মুঘল সম্রাট গহনা, অলংকার ও বহুমূল্য রত্ন রেখে গিয়েছেন—তাই জমানো টাকা ছয় কোটির বেশি হবে না। সুতরাং মুঘল অর্থনীতিতে জোয়ার এলেও ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন আসেনি

Scanned with CamScanner

যদিও তার সূচনা হয়েছিল। সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের ফলে বাণিজ্যিক লগ্নি উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে পারেনি।

সামাজিক রীতিনীতি পুঁজি তৈরি করতে সাহায্য করেনি। মুঘল ভারতে পুঁজির একটা ছোট অংশ চলে যেত কারিগরী উৎপাদনে। বড় অংশটি যেত পথঘাট তৈরি, সরাইখানা বানানো, দুর্গ তৈরি করতে যেগুলি বাণিজ্যিক কাঠামো তৈরি করতে সাহায্য করে। বণিকদের পুঁজির একটা অংশ যেত তাদের গুদাম ও দোকান রাখতে ও মালের আগাম দিতে। অনেক সময়ে বণিক দোতলা বাড়ির উপরের তলায় বাস করত এবং নীচের তলায় ছিল গুদাম ও দোকান। একতলা বাড়ি হলে বণিক দোকানের পিছনের দিকে বাস করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসি পর্যটক মোদাভ উত্তর ভারতের বহু শহরে এ ব্যবস্থা দেখেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে খাম্বাজ শহরে এরকম বহু বাড়ি বিক্রির দলিল দেখা যায়। শহরে বাড়ি ভাড়াও পাওয়া যেত। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি সুরাট ও খাম্বাজ শহরে বণিকদের বাড়ি ভাড়া নিয়ে কাজ-কারবার চালাত। ফরাসিরা সুরাটে বিখ্যাত বণিক মুহম্মদ আলির একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যবসা করছিল। কিন্তু কারিগরদের বাড়ির কোনো খবর পাওয়া যায় না। বার্নিয়ার বলছেন যে দিল্লির সরকারী কারখানায় যেসব কারিগররা কাজ করত তারা সকালে বাইরে থেকে আসত এবং সূর্যাস্তের পর চলে যেত। শহরের মধ্যে এরা থাকত না এটা সুনিশ্চিত, যদিও দিল্লিতে কুঁড়েঘরের অভাব ছিল না। সম্ভবত এরা থাকত শহরতলিতে যেখানে হয়ত জমি ছিল তুলনামূলকভাবে সস্তা। সুতরাং ইউরোপীয় কারিগরী ব্যবস্থা ও কারিগরদের অবস্থা মুঘল ভারতের থেকে অন্যরকম। মুঘল-ভারতে শ্রমের মূল্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কারিগরদের মূলধন নেই এবং তার আয় এমন নয় যে পুঁজি জমতে পারে। তার নিজের বিশেষ কোনো মালও জমা থাকছে না। সে আগাম নিয়ে মাল তৈরি করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও নির্ধারিত দরে বণিককে মাল দিচ্ছে। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি একই মানের ও একই ধরনের মাল নিতে চায়। তারা বণিক বা দালালের মাধ্যমে মাল তৈরি করার নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষা করে নমুনা অনুযায়ী মাল তৈরি হল কিনা। এই ধরনের পরীক্ষা কুঠিগুলিতে করা হত। নমুনামত না হলে মাল ফেরত দেওয়া হত যেটাতে বণিকের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি, কারণ বাজারে ঐ মাল সে বেচতে পারবে কিনা সন্দেহ। ফলে বণিক মাল জমা দিত জাহাজ আসার কিছু আগে যাতে পরীক্ষা ভালোভাবে করা না যায়। এতে অবশ্য কারিগরদের ক্ষতির সম্ভাবনা কম—সে আগাম নিয়ে মাল তৈরি করে দিয়েছে। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজরা দেখেছিল যে ভারতীয় বণিকরা বিভিন্ন শহরে ঘুরে বাজার থেকে মাল কিনছে। তারা ঐ চেষ্টা করে দেখল যে নমুনা অনুযায়ী

মাল পেতে গেলে আগাম দিয়ে কাজ করাতে হবে। তখন তারা বণিক বা দালালের মাধ্যমে এই কাজ শুরু করে। ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানির হাতে টাকা থাকায় তারা পরের বছরের মাল আগের বছরে তৈরি রাখত। ফরাসিদের পক্ষে অর্থের অভাবে এ কাজ করা সম্ভব হয়নি। অধিকাংশ সময়ে ফরাসিরা তাদের বণিকের কাছ থেকে বা বাজার থেকে অর্থ ধার করে লগ্নি করত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে দুপ্লেক্স জগৎশেঠের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে আগাম দিতেন ও জাহাজে টাকা এলে শোধ করতেন। কিছু ভারতীয় বণিকের কথা পাওয়া যায় যারা বিভিন্ন শহরে নিজের লোক দিয়ে আগাম দেবার ব্যবস্থা করেছিল এবং সারা বছর ধরেই তারা এই কাজ করত। গুজরাটের বণিক মুহম্মদ ঘৌস এই ধরনের বণিক ছিলেন যার কথা ১৭০০ সালের ফরাসি কাগজপত্রে পাওয়া যায়। সুতরাং আগাম নিয়ে কাজ করবার মধ্যে বিভিন্ন প্রথা ছিল।

এটা এখন পরিষ্কার যে অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত গুজরাট ও বাংলায় প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা, সোনা-রুপোর বাঁট ইত্যাদি আসছিল। এগুলি মুঘল মুদ্রায় রূপান্তরিত করে ভারতীয় পণ্য নিয়ে যাওয়া হত। এই পরিমাণ মুদ্রা বিদেশ থেকে আসার ফলে ঐ দুই জায়গায় মুদ্রাস্ফীতি হবার কথা। কিন্তু মূল্য খুব কম হারে বাড়ছিল এবং সুদের হার প্রায় অপরিবর্তিত ছিল কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিশেষ সময় ছাড়া। চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মালের যোগান বাড়ায় উচ্চহারে মূল্যবৃদ্ধি হয়নি। সুতরাং বলা যায় যে লগ্নি বাড়ছিল বাড়তি মাল যোগান দেবার জন্য। তবে এর সুবিধা বণিকরা যতটা নিয়েছিল কারিগররা তার ছিটেফোঁটাও পায়নি। তাদের অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিতই ছিল। সম্ভবত আরও বেশি কারিগর কাজ পেয়েছিল। সেটা পূর্ণ সময়ের জন্য বা অর্ধসময়ের জন্য এই বিতর্কে যাবার প্রয়োজন এখানে নেই।

মালের চাহিদা ও যোগান বাড়লেও শিল্পকাঠামো এমন ছিল যে বড় বড় শিল্পে বিশাল লগ্নি করার প্রয়োজন ছিল। বাণিজ্য বাড়ার ফলে জাহাজের তৈরিও নিশ্চয়ই বেড়েছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী বলা যায় যে ঐ শিল্পে বিশেষ লগ্নি বাড়েনি। সম্ভবত প্রতি একক উৎপাদন বাড়ায় কিছু পরিমাণে লগ্নি বেড়েছিল। ফরাসি পর্যটক তাভারনিয়ার হীরক শিল্পে বিশাল সংখ্যক কারিগরের কথা বলেছেন। কিন্তু এখানে জমি কেনার কোনো প্রশ্ন ছিল না। সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে শাসকের অনুমতি নিয়ে ঐ জমিতে কাজ করা যেত। বণিকরা বাড়তি টাকা পেলেও এবং বাড়তি মাল তৈরি করালেও বাজারে টাকাটা ছাড়েনি। অর্থাৎ সব মাল তারা বাজারে তৈরি হলেই ছাড়ছে এমন নয়, বার্নিয়ার দিল্লির গুদামে প্রচুর মূল্যবান মাল জমা থাকতে দেখেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হ্যামিলটন বুখানন পাইকারদের ও ছোটো

Scanned with CamScanner

ব্যবসায়ীদের গোলায় প্রচুর মাল জমা থাকতে দেখেছেন। এর কারণ খুব স্পষ্ট নয়। সম্ভবত বাজারে মাল বেশি হলে দাম পড়ে যাবার ভয় ছিল।

বণিকরা ভবিষ্যতের আশায় লগ্নি করেছে সম্ভবত এমন একটা সময়ে যখন কারিগরদের হাতে বিশেষ কাজ নেই। তবে রাজনৈতিক কারণ, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা বিদ্রোহের ফলে উৎপাদন কিছুটা সময়ের জন্য ব্যাহত হলেও স্থায়ী প্রভাব পড়েনি। বাংলায় শোভা সিংহ ও রহিম খানের বিদ্রোহ ও লুটতরাজ, উত্তর ভারতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠাদের ক্রমাগত হামলা ইত্যাদি উৎপাদনে কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলেনি। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ইংরেজ কোম্পানির দখলে গেলে তারা উৎপাদন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে যার ফলে কারিগরদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে।

মুঘল ভারতের হস্তশিল্প সমকালীন বিস্ময় সৃষ্টি করলেও, তার প্রযুক্তির কোনো পরিবর্তন বহুকাল হয়নি। কারিগরদের যন্ত্র ছিল সরল, নিচুমানের ও পরম্পরাগতভাবে পাওয়া। চতুর্দশ শতকের চরকা ও উল্লম্ব তাঁতযন্ত্র ছাড়া ভারতের বিখ্যাত বস্ত্রশিল্পের প্রযুক্তির বা যন্ত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। জাহাজে *অ্যাস্ট্রোল্যাব* ছাড়া আর কোনো যন্ত্র ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর এক ফরাসি বণিক বলেছেন যে ভারতীয় জাহাজে কামানগুলি ঠিকমত বসানো হয় না যার ফলে তাদের শক্তিও কম। বিখ্যাত মুঘল প্রাসাদ ও অন্যান্য সৌধ তৈরি হত পরম্পরাগত সরল যন্ত্র দিয়ে। চিন বা ইরানে যেসব যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল সেগুলো মুঘল ভারতে চালানোর কোনো চেষ্টা হয়নি। আগেই বলা হয়েছে যে সুরাটে ছাপার যন্ত্র বসানোর চেষ্টা ইউরোপীয়রা করলে লেখনীকাররা কাজ হারাবে এই ভয়ে ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা হয়। সুতরাং মুঘল-ভারতে যে শিল্পবিপ্লব হবার সম্ভাবনা বা মানসিকতা ছিল না এটা সহজেই অনুমেয়। মানুষের শ্রম দিয়ে যে কাজ করা যায় যন্ত্র দিয়ে সে কাজ করানোর কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

কতকগুলি ক্ষেত্রে একটু উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্রোঞ্জের ভারী কামান তৈরি হচ্ছিল। *মালিক-ই ময়দান* নাম বারো ফুট চার ইঞ্চি লম্বা কামান তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া ছিল লোহার হালকা কামান যদিও লোহার কামানের কাজ খুব উন্নত হয়নি। আকবর পরপর কামান সাজিয়ে একের পর এক গোলা ছোঁড়ার প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। কিন্তু ঐ পরীক্ষা খুব সাফল্য পায়নি ও গৃহীত হয়নি। বার্নিয়ার অবশ্য হাত-বন্দুকের প্রশংসা করেছেন যেগুলি সরকারী কারখানাতে তৈরি হত। শিখরা পরে কাঠের বন্দুক তৈরি ও ব্যবহার করছিল। সরকারী কারখানাতে চকমকি ও গাদা বন্দুক দুই-ই তৈরি হত। কারুশিল্পে অবশ্য মুঘল ভারত খুবই উন্নতি করেছিল, কিন্তু তার জন্য বোধহয় দায়ী ছিল কারিগরদের নৈপুণ্য। আকবর আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিলেন, যার

মধ্যে ছিল একসঙ্গে অনেকগুলি বন্দুকের নল পরিষ্কার করা, কিন্তু সেগুলি পরে প্রসারলাভ করেনি।

কিন্তু একাধিক ক্ষেত্রে ভারতীয় কারিগররা নতুন কলাকৌশল নিতে দ্বিধা করেনি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপীয় জাহাজ তৈরি শুরু হয়ে যায় নতুন কলাকৌশল গ্রহণ করে। অবশ্য ষষ্ঠদশ শতাব্দীর গোড়াতেই বাংলাতে পর্তুগিজদের ধরনে জাহাজ তৈরি হচ্ছিল একথা এক অনামা পর্তুগিজ দোভাষী ১৫২১ সালে বলে গিয়েছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ পর্যটক ওভিংটন সুরাটে জাহাজ তৈরির ছুতোরদের প্রশংসা করে বলেছেন যে তারা যে-কোনো ইংরেজ বা ওলন্দাজ জাহাজ থেকে ভালোভাবে তৈরি করতে পারে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য ইউরোপীয় কারিগর আনা হয়েছিল যা দেখা যায় অস্ত্র তৈরি বা রেশম তৈরির কাজের মধ্য দিয়ে। সপ্তদশ শতাব্দীতে নানা রঙের ছাপ দেওয়ার জন্য কাঠের ছাঁচ তৈরি করা হয়েছিল যেটা ঐ সময়ে ছিল নতুন। ইংরেজ পর্যটক ওভিংটন বলেছেন যে ভারতীয় দর্জিরা ইউরোপীয় মহিলা ও পুরুষের জন্য ইউরোপীয় পোশাক তৈরি করতে পারত। অর্থাৎ কয়েকটি ক্ষেত্রে নতুন কলাকৌশল নেওয়া ছাড়াও প্রধান নিয়ম ছিল কারিগরদের নৈপুণ্য। যে ধরনের প্রযুক্তি নেওয়া হয়নি সেটা হচ্ছে একই মানের ও একই ধরনের ঢালাও উৎপাদন করা।

এটা অবশ্য মনে রাখা দরকার যে এই পরম্পরাগত ও পরিবারভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা দশ কোটি লোকের চাহিদা মেটাত। এদের মধ্যে ছিল বিত্তশালী বণিক, অভিজাত সম্প্রদায় ও সম্রাটের ও তাঁর পরিবারের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার চাহিদা। সুতরাং এই প্রথাকে ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চাদ্‌মুখী বলা শক্ত। ঐ প্রথা ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিশাল আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। যেহেতু শ্রমিক-মজুর ছিল সংখ্যায় অত্যন্ত বেশি এবং তাদের মজুরি ছিল খুবই কম, সুতরাং শ্রম বাঁচানোর কোনো চেষ্টা করা হয়নি। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এই চিত্রটা পালটে যেতে থাকে। ইউরোপীয় কলাকৌশল, বিশেষত সামরিক বিদ্যায় ও অস্ত্রেশস্ত্রে, ভারতীয়দের তুলনায় উন্নত হতে থাকে। মুঘল ভারত নতুন প্রযুক্তি নিতে অস্বীকার করে, ভারতীয় রাজনীতি পিছিয়ে যায়। এই সাংস্কৃতিক দুর্বলতা প্রয়াত অধ্যাপক আথার আলি একটি প্রবন্ধে আলোচনা করে গিয়েছেন।

ক্রমে ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজার বিশেষ ধরনের পণ্য চাইতে থাকে যা যোগানোর জন্য বিশেষ ধরনের কারিগরের প্রয়োজন হতে থাকে। নতুন নতুন পেশার কারিগর তৈরি হয় যাদের থেকে নতুন জাতেরও সৃষ্টি হয়। এই বিশেষ পণ্যের চাহিদা অনেক সময়ে পূরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রবার্ট

Scanned with CamScanner

ওরমে বলেছেন এক ধরনের কাপড়ের কথা যেটা কেবলমাত্র বাংলার একটি গ্রামে তৈরি হত। আর এক বিদেশী পেলসার্ট বলেছেন যে ইউরোপে যে কাজ একজন লোক করে এখানে সেটা চারজনের মধ্য দিয়ে যায়। এর ফলে যন্ত্রের প্রয়োজন শুধু কমছে তাই নয় উৎপাদন পদ্ধতির বদল করা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। কারিগরের পেশা নির্ধারিত হত উত্তরাধিকার সূত্রে যেটাও বদলানো সম্ভব ছিল না কারণ সেটা সমাজব্যবস্থার অঙ্গ। এই ধরনের উত্তরাধিকার প্রথা মুসলমান কারিগরদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছিল। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া পার্শীরাও এর বাইরে যায়নি। একদিকে যেমন প্রথার মধ্যে আভ্যন্তরীণ গতিশীলতার অভাব, অন্যদিকে স্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনাও নেই। আগেই আমরা দেখেছি যে ভারতীয় কারিগররা তাদের পুরনো বাসস্থান ও কাজের জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গাতে যেতে চায় না। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। সিন্ধুর তাঁতিরা বোম্বাই গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানান কারণে খাম্বাজের তাঁতিরা বোম্বাই এবং মারাঠা অধ্যুষিত অঞ্চলে চলে যেতে থাকে। কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেড়েছিল প্রধানত বণিক ও কারিগরদের আগমনে যখন তারা রাজনৈতিক অশান্তির হাত এড়িয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে। সি. এ. বেইলীর মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর ভারতে ইংরেজদের উৎসাহে ও অর্থে নতুন বণিক, কারিগর শ্রেণী ও নতুন শহরের জন্ম হচ্ছে যেখানে পুরনো শহরগুলি ভেঙে যাচ্ছে। এর মধ্যে অনেকখানি সত্যতা আছে। তবে বেইলি বলেননি যে ইউরোপীয়দের আগ্রাসী রাজনীতির ফলে এই পরিবর্তন এসেছিল। অযোধ্যার ইতিহাস অন্তত এই কথাই বলে।

আগেই দেখা হয়েছে ছাপাখানা বসানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এসেছিল লেখনীকারদের কাছ থেকে যার ফলে ওটা বসানো বন্ধ হয়ে যায়। ওলন্দাজরা এমন যন্ত্র বসানোর চেষ্টা করে যাতে বহুসংখ্যক কামানের গোলা একসঙ্গে তৈরি হতে পারে। এটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। আসলে বণিক বা অভিজাতরা উৎপাদন পদ্ধতির বদল করা নিয়ে কোনো উৎসাহ দেখায়নি। বদল করতে পারত কারিগররা। কিন্তু নতুন যন্ত্র বসানোর মত লগ্নি বা পুঁজি তাদের ছিল না। তাছাড়া ঐ ধরনের বদলের ঝুঁকিও আছে—বাজার সেটা গ্রহণ করবে কিনা এটা অনিশ্চিত। সুতরাং সাধারণ কারিগর পদ্ধতি বদলাতে উৎসাহী ছিল না। বাইরে থেকে দেখলে কারিগররা স্বাধীন ও মুক্ত, কিন্তু তাদের অবস্থা প্রায় দাসেদের সমান। পুঁজি না থাকার ফলে দাদন নিয়ে কম দামে তাদের উৎপাদন দালাল বা বণিকের কাছে বাঁধা রাখতে বাধ্য হত। এর ফলে তাদের শ্রমের ও নৈপুণ্যর যথার্থ পারিশ্রমিক পেত না এবং অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কাল কাটাত। ১৭০০ সালে ফরাসি বণিক হুগলীতে তাঁতিদের এই অবস্থার মধ্যে দেখেছিলেন। ফলে এরা হয় অভিজাত, নয়ত দালাল বা বণিকের অধীনস্থ হয়ে

থাকত। বণিকের দালালরা তাদের নানাভাবে ফাঁকি দিলেও ওদের করার বিশেষ কিছু ছিল না। বলা বাহুল্য, ভারতীয় কারিগররা এই অবস্থায় পড়ে ইউরোপীয় কারিগরদের মত সম্পদ সৃষ্টি করতে পারেনি যার ফলে শহরগুলিতে ঝুপড়ির মধ্যে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিতে বাধ্য হত। এখান থেকেই সে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে গিয়েছে। ওদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে বণিক বা রাষ্ট্র, যে ধরনের পরিবর্তন জাহাজ তৈরির কারখানায় যা অস্ত্র তৈরির কারখানায় কিছু পরিমাণে দেখা যায়।

মুঘল ভারতে পরিষেবার কাজে বহু লোক নিযুক্ত ছিল যারা সরাসরি উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত নয়। মোরল্যান্ড এদেরকে ভোগী-শ্রেণীর মধ্যে ধরেছেন। এরা উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল থাকার জন্য মোরল্যান্ড এই অর্থনীতিকে পশ্চাদ্‌মুখী বলে অভিহিত করেছেন। ওঁর মতে জনসাধারণের একটা বড় অংশ উৎপাদন করে না। এটা অবশ্য বলা দরকার যে, মোরল্যান্ডের কথা মেনে নিলেও, মুঘল রাষ্ট্র এমন সমাজব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করছে যেখানে বহু লোকের কাজের চাহিদা আছে। আরো দেখা যায় যে রাষ্ট্রের সম্পদের বড় একটা অংশ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে গিয়েছে যাদের জীবনযাত্রা অনুসরণ করে আরও নীচের আমলারা অসংখ্য কাজের চাহিদা তৈরি করছে। ক্ষেতের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি থাকায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব বিশেষ হয়নি। মজুর অনেক সংখ্যায় থাকায় উৎপাদন বাড়াতে অসুবিধা হয়নি। এদের একটা অংশ শহরে দাস ও ভৃত্য হিসাবে থাকলেও, যেমন সুরাট শহরে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় ছিল, এবং উৎপাদন পদ্ধতি থেকে সরে এলেও, উৎপাদনের ক্ষতি হয়নি ; বরঞ্চ ভোগ্যপণ্যর চাহিদা বাড়িয়েছে।

মোরল্যান্ড যাদেরকে ভোগী-শ্রেণীর মধ্যে ধরেন তারা যে উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে ছিল অথচ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল বলে বলছেন তারা সত্যিই উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে ছিল কিনা ভেবে দেখা দরকার। এরা প্রধানত মনসবদার, জমিদার ও নীচুস্তরের আমলা, যারা রাজস্ব সংগ্রহ করে নিজেদের বেতন নিচ্ছে ও সরকারকে দিচ্ছে। এই প্রথার সঙ্গে ইউরোপীয় সামন্তপ্রথার তুলনা করা যাবে না কারণ এদের জন্ম, চরিত্র ও কাজের পরিধি আলাদা। এদেরকে কেবলমাত্র ভোগী-শ্রেণীও বলা যাবে না। এরা আইন-শৃঙ্খলার প্রয়োগ করে উৎপাদন পদ্ধতি চালু রেখেছিল। এর ফলে উৎপাদন পদ্ধতি বেড়েছিল ও বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল।

বার্নিয়ার-এর একটি মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে মোরল্যান্ড বলছেন যে মুঘল ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না। হয় অভিজাত না হলে গরিব লোকেরাই কেবল ছিল। এটা মেনে নিলে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের চরিত্র বদলে যায়। সম্প্রতি ইকতিদার আলম খান একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে সুলতানি যুগের শেষ থেকেই

Scanned with CamScanner

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে পেশাদারী লোক যেমন হাকিম, কবিরাজ ইত্যাদি, ছোট বণিক ও ছোট আমলা যারা জমিদার ও মনসবদারদের কাছারিতে কাজ করত। এদের মাস-মাহিনা অত্যন্ত সামান্য হলেও এদের নানাভাবে অন্য উপার্জন ছিল যার মধ্যে সম্ভবত উৎকোচ ও টাকা আত্মসাৎ করাই ছিল প্রধান। এই মধ্যবিত্তদের আসার আভাস বহুপূর্বে ভব্লিউ. সি. স্মিথ দিয়েছিলেন। আলম দেখাচ্ছেন এই নীচুস্তরে আমলাদের অনেকেই মসজিদ, কুয়ো ইত্যাদি তৈরি করে দিয়েছে। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহ দিল্লি জয় করে সতেরো জন আমলার কাছ থেকে ত্রিশ লক্ষেরও বেশি টাকা আদায় করেছিলেন। এদের মধ্যে দু'লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মুহুরীরা দিয়েছিল যাদের প্রত্যেকের মাস-মাইনে ছিল সতেরো টাকা। এই ছোট আমলাদের উপর মনসবদার ও জমিদার এত নির্ভরশীল ছিল যে ওদের সম্পদ সৃষ্টি করতে বাধা হয়নি। এদের সচ্ছল জীবনযাত্রার চাহিদা বৃদ্ধি পেলে পণ্য উৎপাদনও বাড়তে থাকে।

বার্নিয়ার-এর আর একটি মন্তব্যর উপর ভিত্তি করে মোরল্যান্ড বলছেন যে পেশাগত কাজের কোনো চাহিদা ছিল না। এর মধ্যে তিনি ধরেছেন যে যেহেতু ভারতে ইউরোপীয় ধাঁচের কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় নেই, অতএব শিক্ষকের চাহিদাও নেই। শিক্ষকরা ছাত্র পড়াতেন নিজের বাড়িতে যার মধ্যে ভালো ছাত্রের জন্য কোনো সম্মান অপেক্ষা করে নেই। অতএব উনি ধরে নিয়েছেন যে সমকালীন ইউরোপের তুলনায় মুঘল ভারতে পেশাদারদের কোনো চাহিদা নেই।

বার্নিয়ার ও মোরল্যান্ডের এই বক্তব্য মেনে নেওয়া কঠিন। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবিদের লেখা থেকে পাওয়া যায় যে নবদ্বীপে প্রচুর সংখ্যায় শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা সকাল-বিকাল প্রায় একশো ছাত্র করে পড়াতেন হয় নিজের বাড়িতে, নয়ত চণ্ডীমণ্ডপে। এদের মধ্যে অনেকেই বিত্তবান ছিলেন এবং বহুছাত্র ওঁদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত। এরকম বেশকিছু লোকের কথা পাওয়া যায় যাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জমিদার বা রাজা। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী আড়ড়্যার ব্রাহ্মণভূমির জমিদারের আশ্রয়ে ছিলেন ও তাঁর ছেলেকে পড়াতেন। শাহজাহান এরকম একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সব বিদ্যাকেন্দ্র থেকে নামী কোনো শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা শেষ করলে ঐ ধরনের কাজ পাওয়া যেত। মুসলমানদের জন্যও ঐ ধরনের কেন্দ্র কয়েকটি শহরে গড়ে উঠেছিল যার মধ্যে জৌনপুর ছিল অন্যতম। মুসলমানদের মক্তবে ও মাদ্রাসায় শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। তবে শিক্ষার গুরুত্ব ছিল অনেক কম। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় পূর্ণিয়ার নবাবের বাড়িতে যে গৃহশিক্ষক ছিলেন তাঁর মাস-মাহিনা ছিল মালির মাহিনার সমান। তবে তাঁর থাকা বা খাওয়া-দাওয়ার জন্য তাঁর কোনো খরচ ছিল না।

এদের থেকে আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নিচুতে ছিলেন মোল্লা, গণৎকার, পূজারি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। এদের মধ্যে রাজানুগ্রহ পেয়ে কেউ কেউ বিত্তশালী হয়েছিলেন। জাহাঙ্গির এরকম এক হিন্দু গণৎকারের উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে যাঁর পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। রাজসভায় আরও অনেক শিল্পী—যেমন, চিত্রকর, গায়ক ইত্যাদি ছিলেন যাঁরা সম্ভ্রান্ত ঘর থেকে আসেননি। আকবরের দরবারে অন্তত তিনজন কবি ছিলেন যাঁরা আগে ছিলেন শস্য ব্যবসায়ী, অস্ত্র তৈরির কারিগর ও মাহুতের ছেলে। এছাড়াও ছিল মনোরঞ্জনকারীদের দল যাদের মধ্যে ছিল পালোয়ান, লাঠি খেলার ওস্তাদ, জাদুকর (এরকম একদল বাংলা থেকে এসে জাহাঙ্গিরকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল), গায়ক, নাচনীওয়ালি (একজনের কথা বার্নিয়ার বলেছেন) যারা বিভিন্ন পরবে ও উৎসবে অবশ্যই উপস্থিত থাকত। পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশার বার-বনিতারা বিভিন্ন স্তরভেদে বড় বড় শহরে থাকতেন। সাধারণত শহরের একপাশে এরা থাকতেন। এঁরা অবশ্য রাজকর দিতেন এবং প্রয়োজন হলে গুপ্তচরের কাজও করতেন। লাহোরে প্রায় দু'হাজার এরকম বাড়ি ছিল যেখান থেকে কোতোয়াল সাপ্তাহিক কর আদায় করতেন। এছাড়া ছিল শারীরিক কসরৎ দেখানোর লোক, আতস বাজীর কারিগর ইত্যাদি যারা বহু সময়েই অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল। পর্যটক মানুচ্চি বলেছেন যে চিকিৎসকরা বাজারে বসতেন। পর্যটক জন ফ্রায়ার বলেছেন যে চিকিৎসকরা ওষুধের দামের মধ্যেই তাঁর পারিশ্রমিক ধরে রাখতেন। বিদেশী চিকিৎসকের খুব চাহিদা ছিল। মুঘল সম্রাটদের বিদেশী চিকিৎসক ছিলেন প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। মানুচ্চির লেখায় এই চাহিদার কথা পাওয়া যায়।

সাধু, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের মোরল্যান্ড পরগাছা বলে অভিহিত করেছেন। একদিক থেকে দেখলে এটি মানতে দ্বিধা নেই, কারণ এরা কিছু উৎপাদন না করে তার উপর নির্ভরশীল। ঐ অর্থে মন্দিরের পূজারি ও মসজিদের মোল্লাকেও ঐ দলে ফেলা যায়। বলা বাহুল্য, সে ক্ষেত্রে ইউরোপ ও ভারতে গির্জার পাদ্রিদেরও ঐ দলে ফেলতে হয়। কিন্তু যে সময়ে ধর্ম সাধারণ মানুষের একটা বড় আশ্রয়স্থল ছিল, সে সময়ে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, এদের কাজ ছিল মানুষের মানসিক অশান্তি নেভানো। ইউরোপের গির্জার জাদুকররাও অনেক সময়ে এই ধরনের কাজ করেছে। এইসব ফকির, সন্ন্যাসীদের জীনযাত্রার ব্যয়ভার বহন করত সাধারণ মানুষ যার ফলে এরা সমাজের একটা অঙ্গ হয়ে ওঠে, যদিও ওরা দাবি করে যে ওঁরা সমাজের বাইরে। ছোট ছোট শহরগুলিতে ধর্মমতের জোয়ার যে বেশি ছিল সেটা আমরা নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের উত্থান ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের মতভেদের মধ্যে পাই।

নিয়ম অনুযায়ী মনসবদারদের সৈন্য রাখতে হত। জমিদাররাও সৈন্য রাখতেন—সম্ভবত আধা-সামরিক বাহিনী। সমগ্র ভারতে দশ কোটি লোকসংখ্যা ধরে

Scanned with CamScanner

মোরল্যান্ড সমগ্র ভারতের সৈন্যসংখ্যা দশ লক্ষর কাছাকাছি ধরেছেন। এরা কেউই অবশ্য উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল না। কিন্তু উৎপাদন পরিষেবার ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব যে অপরিসীম সেটা প্রশাসনও স্বীকার করত। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখা উৎপাদনের পক্ষে জরুরি এবং সেই কাজটা সৈন্যবাহিনীকে দিয়ে করানো হত।

এই দশ লক্ষ লোকের পণ্যের চাহিদা খুব বেশি না হলেও কিছু ছিল। অস্ত্রশস্ত্রের চাহিদা তো ছিলই। তাছাড়া ঘোড়া ও তার সরঞ্জামের চাহিদা ছিল। এক ঘোড়সওয়ারের ব্যক্তিগত আয় ছিল মাসিক পনেরো টাকার মত। ঐ সময়ে একজন কুস্তিগীরের আয় ছিল মাসিক দু'টাকা এবং একজন শ্রমিকের দৈনিক আয় সাত দামের নিচে। মাসে এটি চার টাকার কাছাকাছি। সুতরাং নিম্নমধ্যবিত্ত পেশাদার শ্রেণীর উচ্চস্তরে ছিল ঘোড়সওয়ার। অবশ্য পদাতিকের মাহিনা ছিল অনেক কম—তাও শ্রমিকের উপরে। অতএব এদের সম্মিলিত চাহিদা কারিগরী শিল্পের প্রসারে সাহায্য করেছিল। প্রশাসনের কাছে এদের গুরুত্ব কতটা ছিল বোঝা যায় যখন দেখা যায় যে আমেদাবাদের হাসপাতালের চিকিৎসকরা এদের সমান মাহিনা পেতেন।

অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার মর্যাদার প্রতীক ছিল অসংখ্য দাস-দাসী ও ভৃত্যকুল। আপাতদৃষ্টিতে এদের মধ্যে তফাত না থাকলেও একটা আইনগত তফাত ছিল। ভৃত্যরা মাহিনা পেত এবং তারা এক প্রভুকে ছেড়ে অন্য প্রভুর কাছে যেতে পারত, যেটা দাস-দাসীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দাস-দাসীরা অবশ্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা পেত। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত দিল্লিতে দাস-দাসীর বাজার ছিল যেটা ফরাসি পর্যটক মোদাভ বলেছেন। একটি বিষয়ে দাস-দাসী ও ভৃত্যকুলের মিল ছিল। এরা প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ ধরনের কাজ করত। ফলে বহুজন একই কাজের অংশবিশেষ করত। বলা হয় যে একজন অপরের কোনো কাজ করবে না। সম্রাটের প্রাসাদেও এই প্রথা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আকবরের হারেমে পাঁচ হাজার মহিলার প্রত্যেকের জন্য দু-তিনজন করে দাসী ছিল। ভৃত্যদের মাহিনা ছিল খুবই কম। ১৬২০ সাল নাগাদ পশ্চিম উপকূলে বিদেশী পর্যটকরা বলছেন ভৃত্যদের খাওয়া, জামাকাপড় ও মাইনে সমেত পড়ত মাসে দশ শিলিং-এর মত। এর পরও বেগার খাটানোর রেওয়াজ ছিল যার উল্লেখ সমকালীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে শ্রমের মূল্য এত কম থাকার ফলে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকার ফলে সৈন্যদলে ও ভৃত্যকুলে যোগ দেবার লোকের অভাব ছিল না। সম্রাটের তাঁবুতে দাস-দাসী ও ভৃত্য মিলিয়ে দুই থেকে তিন হাজার লোক ছিল। সৈন্যরা যুদ্ধে গেলে বিরাট সংখ্যক লোক তাদের সাহায্যের জন্য যেত। এদের পণ্যের চাহিদা সামান্য হলেও সম্মিলিতভাবে সেটা বেশ বেশি।

গ্রামাঞ্চলে ও শহরে বিভিন্ন জাতের লোক বিভিন্ন পেশার কাজ করছে। গ্রামাঞ্চলে পরিষেবা দিত পূজারি, নাপিত, লৌহকার, তেলি ইত্যাদি যারা উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। বিনিময়ে এরা সম্ভবত নিষ্কর জমি ভোগ করত বা শস্য পেত। গ্রামের চৌকিদার, হিসাবরক্ষক, সেচ ব্যবস্থার লোকেরাও এই ধরনের মধ্যে পড়ে। এরাই কৃষক ও কারিগরদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান করাত, রাজস্ব দেবার হিসাব রাখত। শহরাঞ্চলেও যে এই ধরনের পেশাগত লোক ছিল তার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ষষ্ঠদশ শতকের শেষে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তাঁর কল্পিত নগর গুজরাটে বিভিন্ন পেশার ও জাতের লোকেরা নানান পণ্য উৎপাদন করে নিজেরাই বিক্রি করছে। কারিগরই যে বিক্রেতা এবং সুতো কাটার জন্য দাদন নেওয়া ছাড়া মহাজনের বিশেষ উল্লেখ নেই। এদের উৎপাদন প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য যাদের চেহারা সমকালীন বৈষ্ণব কবিতায় পাওয়া যায়। কারিগরী শিল্পের বিভাজন ও তার উন্নতি নিয়ে সন্দেহ নেই, যদিও উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ কোনো কথা নেই। ওঁর রচনায় কারিগরদের দারিদ্র্য বা দৈন্যের কথাও নেই। নগরটিও বাণিজ্যিক—একদিকে বারবধূরা বসে যার থেকে মনে হয় বিদেশের ব্যাপারীদের আনাগোনা ছিল। কিন্তু এ শহর যে উচ্চবিত্তর শহর নয় সেটা পরিষ্কার।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই মুঘল অর্থনীতিতে জোয়ার আসছিল প্রধানত শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে। কিন্তু এই জোয়ার সারা অর্থনীতিতে প্লাবন আনেনি। কৃষিতে পর্তুগিজদের আনা নতুন পণ্য উৎপাদন হলেও কারিগরী শিল্পে বড় রকমের কোনো পরিবর্তন আসেনি। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিদেশী কোম্পানিগুলির চাহিদা যত বেড়েছে বস্ত্রশিল্প তার পুরাতন পরিবারভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে ঐ চাহিদা পূরণ করতে পেরেছে। সুতরাং বণিক বা কারিগর কেউই উৎপাদন পদ্ধতি বদলানোর ঝুঁকি নেয়নি। বণিকরা বরাবরই চেষ্টা করেছে কারিগরকে ও তার শ্রমকে কত কম খরচে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তার উৎপাদন পদ্ধতি কী হবে মাথা ঘামায়নি। কেবল মাঝে মাঝে তাঁতের মাপ কমানো-বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে বাজারের চাহিদা মেটাতে। ক্রমে বণিকরা কারিগরকে দিনমজুরে পরিণত করে ক্রমবর্ধমান বাজারী চাহিদা মেটানোর জন্য। অষ্টাদশ শতকের শেষে দিনমজুরিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় যার উপর ঔপনিবেশিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে।

বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্য, প্রধানত বস্ত্র, শুধু উন্নত মানের ছিল তাই নয় তার মূল্যও ছিল অপেক্ষাকৃত কম। মোরল্যান্ড বলেছেন যে সারা মধ্যপ্রাচ্যের বাজার ভারতীয় বণিকদের হাতের মধ্যে ছিল যার ফলে ভারতীয় বণিক ও কারিগর তীব্র কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়নি। তাই বস্ত্রের অধিকাংশই ছিল সাধারণ মোটা

Scanned with CamScanner

কাপড় যার মূল্য কম ও উৎপাদন পদ্ধতি সরল। কারিগরদের দারিদ্র্য ও তাদের সহজ সরল জীবনযাত্রা ও পণ্যের দাম কমিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল। সুতরাং বিদেশী বাজারে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বাড়লেও ভারতীয় বণিক ও কারিগর উৎপাদন পদ্ধতি বদলায়নি। এই অবস্থায় মুঘল ভারতে শিল্পবিপ্লব আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

বিদেশের বাজারের, বিশেষত এশিয়ার বাজারে আপামর জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ যে অবস্থা মুঘল ভারতের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। সুতরাং মুঘল ভারতে কারিগর জনসাধারণের জন্য কম দামের পণ্য তৈরি করত যদিও আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা বেড়েই চলেছিল। ইউরোপের তুলনায় মুঘল ভারতে মধ্যবিত্তের সংখ্যা ছিল খুবই কম যদিও ঐ সংখ্যা বাড়ছিল। অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার চাহিদা পূরণ করার জন্য বিশেষ বিশেষ কাজ কয়েক ধরনের কারিগররা করত যারা ক্রমে আলাদা জাতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এরা জনসাধারণের ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করতে পারত না। এর ফলে উৎপাদন একটা মাত্রার পর আর বাড়তে পারছে না এবং কারিগররা ছোট ছোট জাতে বিভক্ত হয়ে থাকছে। মুঘল অভিজাতদের চাহিদা থাকলেও ভারতীয় কারিগররা সব ধরনের চাহিদা পূরণ করার উৎসাহ দেখায়নি যার কারণ খুব স্পষ্ট নয়। মুঘল অভিজাতরা বিলাতি খেলনা, বিশেষত দম দেওয়া খেলনা এবং ঘড়ি পছন্দ করতেন। কিন্তু ভারতীয় কারিগররা এই দুটি পণ্য উৎপাদন করার কোনো উৎসাহ দেখায়নি। এছাড়াও ইউরোপের মতো কারিগররা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে আসেনি, বণিকদের সঙ্গে তাদের সেরকম কোনো সংঘাতও হয়নি। মুঘল ভারতের উৎপাদন পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি এত বিশাল নয় যে গোটা উৎপাদন পদ্ধতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

মুঘল যুগে শহরের সঙ্গে লাগোয়া জমি থাকত যার রাজস্ব শহরের রাজস্বর মধ্যে ধরা হয়। আবুল ফজল তাঁর *আইনে* শহরের সঙ্গে লাগোয়া জমির হিসাব দিয়েছেন। ঐ জমিতে গ্রাম ছিল এবং তার উৎপাদন শহরে আসত যার চেহারা আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর খাস্বাজের ইতিহাসের মধ্যে পাই। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামীণ উৎপাদন ও শহরের উৎপাদনের মধ্যে সীমারেখা অস্পষ্ট, যদিও গ্রামীণ উৎপাদন শহরে আসতে গেলে কর দিতে হত। কিন্তু শহরতলিতে কারিগররা বসায় সংলগ্ন গ্রামের সঙ্গে তাদের যোগ ছিল। কিন্তু শহর থেকে আলাদা গ্রামে জাতিভিত্তিক কারিগর ছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর দাক্ষিণাত্যে এদের বলা হত *বারো বালুতাদার* সম্ভবত বারোটি জাত ছিল বলে। এদের মধ্যে গ্রামের দাসরাও ছিল। এদের মধ্যে পূজারি, ধোপা, নাপিত, কুম্ভকার, মুচি, ছুতোর ইত্যাদিও রয়েছে। এরা ছাড়াও আরও বারোজন গ্রামীণ কারিগর ও দাস ছিল যাদেরকে বলা হত *আলুতাদার*। সাধারণত বড় বড় গ্রামে

এরা ছিল। এদের মধ্যে ছিল লিঙ্গায়েত পুরোহিত, দর্জি, মালি, ভিস্তিওয়ালা, সঙ্গীতজ্ঞ, রক্ষী, বারুইকার (পান বিক্রি করে), স্বর্ণকার, ভাট ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের এই তালিকার মধ্যে তাঁতি ও রংরেজ (যারা কাপড় রং করে) নেই। বলা যায় এই দুটি শিল্প ছিল শহরের। তিলিকেও (তেল বিক্রি করে) সব গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় না। সম্ভবত গ্রামের লোকেরা কাছের বাজার থেকে তেল কিনত। *বালুতাদার* ও *আলুতাদার*-কে দুটি আলাদা শ্রেণী বলে ধরা হয়, কিন্তু তাদের মজুরির কোনো তারতম্য পাওয়া যায় না। তবে প্রথম শ্রেণীর কতকগুলি স্থায়ী অধিকার ছিল যাকে *ওয়াতন* বলা হত। এটি ছিল প্রধানত গ্রামে নিষ্কর জমি ভোগ করা যেগুলি গ্রামের পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এরাই এই *ওয়াতন* বা নিষ্কর জমি চাষ করত। বহুদিন অনাবাদী থাকলে *ওয়াতন* বিক্রি করা যেত। এর সঙ্গে *যজমানী* প্রথা জড়িয়ে আছে। কৃষকরা *বালুতাদারদের* কাজে লাগাত *যজমানী* প্রথার মাধ্যমে। একই সঙ্গে তারা পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট কাজও করত। বছরে দুবার কৃষকরা হিসাব করে এদের পারিশ্রমিক হিসাবে টাকা দিত। এই টাকা প্রতি *ওয়াতন* অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা থাকত। সম্ভবত ঐ টাকা নগদে না দিয়ে সমমূল্যের বিভিন্ন দ্রব্য দেওয়া হত যার ফলে এর চেহারা *যজমানী* প্রথার মত দাঁড়িয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি গ্রামে ঐ কাজের পারিশ্রমিকের হিসাব পাওয়া গিয়েছে। ছুতোর, মুচি ও দড়ির কারিগর পেত বছরে দশ টাকা। কুম্ভকার পেত পাঁচ টাকা এবং স্বর্ণকার পেত আড়াই টাকা। এই পারিশ্রমিকের ভিত্তি ছিল *ওয়াতন*, কাজের পরিধি নয়। এছাড়া গ্রামের মন্দিরের প্রণামীর একটা অংশ এরা পেত।

এর থেকে বোঝা যায় যে অন্তত পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের ঐসব গ্রামের কারিগররা বাজারের জন্য উৎপাদন করছে না, গ্রামীণ জীবনযাত্রা যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তার জন্য উৎপাদন করছে। কিন্তু ঐসব কারিগরদের স্বাধীনতা ছিল যে তারা একই জাতের লোকেদের কাছে পণ্য উৎপাদন করতে পারে এবং শহরে চলে যেতে পারে। এছাড়াও, গ্রামের চাহিদা মিটিয়ে অবসরে কাছাকাছি বাজারের জন্য উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু আইনত এই কাজ করা সম্ভব হলেও বাস্তবে এই ধরনের কাজ নিয়মিতভাবে করা যেত কিনা সন্দেহ আছে।

নানান কারণে দাক্ষিণাত্যর শহরগুলিতে বিভিন্ন ধরনের কারিগরী শিল্প গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল তাঁত ও রেশমের কাপড় উৎপাদন। প্রায় সারা সপ্তদশ শতাব্দী ধরেই আওরঙ্গাবাদ বিখ্যাত হয়েছিল সাদা তাঁদের ও রেশমের কাপড়ের জন্য। বুরহানপুরে পাওয়া যেত সাদা ও রঙিন কাপড়। এগুলি আর্মেনিয়ান বণিকরা পারস্য, তুর্কি ও আরব দেশে রপ্তানি করত। এছাড়াও এইসব শহরগুলিতে ভালো ক্যালিকো কাপড় সস্তায় পাওয়া যেত। পূর্ব দাক্ষিণাত্যে *চে* নামে এক বিশেষ

Scanned with CamScanner

ধরনের রং পাওয়া যেত যেটা ছিল শাসকদের একচেটিয়া ব্যবসা। মসুলিপত্তনমে চীজ নামে রঙিন কাপড় পাওয়া যেত যেটির চাহিদা ছিল বিদেশের বাজারে। এ সম্পর্কে সমকালীন ফরাসি প্রতিবেদনে (সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) বিশদ তথ্য পাওয়া যায়, বিশেষত এর উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে। মসুলিপত্তনমে ও ওয়ারঙ্গালে ভালো গালিচা তৈরি হত।

নিজামাবাদের কাছে ইন্দালনিতে (ইন্দুর) লোহা ও ইস্পাতের দ্রব্য পাওয়া যেত যার মধ্যে ছিল ছোরা, তরোয়াল, বর্শা ইত্যাদি যেগুলির জন্য লোহা আসত কাছের বালাঘাট পাহাড় থেকে। এখানকার লোহা থেকে ভালো ইস্পাত তৈরি হত যা বিদেশে চালান যেত। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি পর্যটক মাতাঁ লোহা থেকে এখানে ইস্পাত তৈরি হতে দেখেছেন এবং ঐ ইস্পাত যে দামাস্কাসে যাচ্ছে তার বিখ্যাত তরোয়াল তৈরির জন্য তার কথাও বলেছেন। ঐ সময়ে ওলন্দাজরা তাদের কাছাকাছি কুঠিতে লোহা থেকে অস্ত্র তৈরি করার ব্যবস্থা করেছিল। পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি শহরে কারিগরী কাজ হত। গুজরাটের বিখ্যাত বন্দর-শহরগুলি ছাড়াও চাউল শহরে কাপড়ের কাজ হত। জুনাগড়ে কাগজ তৈরি করা শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে।

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সমকালীন ইংরেজ কুঠিয়ালদের লেখার উপর ভিত্তি করে পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের শহর ও শিল্পগুলির ধ্বংসের জন্য মারাঠাদের দায়ী করেছেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে এগুলি যে অসত্য তা প্রমাণিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে পশ্চিম দাক্ষিণাত্য ও গুজরাট মারাঠা আধিপত্যের মধ্যে আসে। দেখা যাচ্ছে যে এরপর থেকে ঐসব অঞ্চলে কারিগরী শিল্প আরও বাড়তে থাকে। পুরনো কেন্দ্র থেকে বণিক ও কারিগররা মারাঠা অঞ্চলে চলে আসতে থাকে। খাম্বাজের উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। অবশ্য গুজরাটের শহরগুলিতে যতটা উন্নতি দেখা যায় মহারাষ্ট্রের শহরগুলিতে ততটা উন্নতি দেখা যায় না। কল্যাণে পিতলের কাজ, আওরঙ্গাবাদে রেশমের জরি দেওয়া কাগজের কাজ শুরু হয়। কিন্তু পুণাতে বিশেষ শিল্প গড়ে ওঠেনি।

শহরের কারিগরও বিভিন্ন জাতের ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে মুকুন্দরামের লেখা থেকে এই বিভাজন স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে মাঝে মাঝে কোনো কোনো জায়গায় বাজারের চাহিদার ফলে পরিবর্তন এসেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দর্জিদের একটা অংশ রং করার কাজ শুরু করে যদিও এতে উৎপাদন পদ্ধতির কোনো বদল হয়নি।

আগেই দেখা হয়েছে যে গুজরাটের কোনো কোনো জায়গায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কয়েকটি শিল্পে পঞ্চায়েত (Guild) রয়েছে যারা ঐ শিল্প ও কারিগরদের

সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ইংরাজরা যখন খাম্বাজে হাতির দাঁত আমদানি করে তখন তার মূল্য স্থির করার জন্য ঐ শিল্পের পঞ্চায়েতের প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। কিন্তু এই ধরনের পঞ্চায়েত বা তার প্রধানের অস্তিত্ব আমরা গুজরাট ছাড়া অন্য জায়গায় মধ্যযুগে দেখতে পাই না। প্রাক্-সুলতানি যুগে এই ধরনের শিল্পের পঞ্চায়েতের ও তার সদস্যদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি সদস্যদের কাছ থেকে সরকারী কর আদায়ও পঞ্চায়েত করত। সুলতানি যুগ শুরু হলে কী অবস্থা হয়েছিল খুব পরিষ্কার নয়। অন্তত গুজরাটে পুরনো ব্যবস্থা চলছিল। সুলতানি ও পরবর্তী মুঘল শাসকরা সাধারণত বণিকদের ও কারিগরদের জগতে হস্তক্ষেপ করেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিক থেকে আমেদাবাদের নগরশেঠ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তার থেকে ঐ শহরের কয়েকটি পঞ্চায়েতের উল্লেখ মেলে। এটা পরিষ্কার যে বহু আগে থেকেই ঐ প্রথা চলছিল। কারিগরী শিল্প নানান অশান্তির মধ্যে বিপদের সম্মুখীন হলে নগরশেঠ অবস্থা সামলানোর দায়িত্ব নিতেন। বোম্বাইতে কারিগরদের আসার অনুকূলে অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য ইংরেজরা বিলেতের গিল্ডের নিয়মগুলি আরোপ করতে থাকে। কিন্তু পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে ঐ ধরনের পঞ্চায়েত বা গিল্ডের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগে স্বভাবতই বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক ও কারিগরদের মজুরির তারতম্য ছিল। সম্ভবত এর কারণ ছিল প্রধানত দুটি। প্রথমটি নির্ভর করত ঐ অঞ্চলের খাদ্যদ্রব্যের মূল্যমানের উপর এবং দ্বিতীয়টি ছিল ঐ অঞ্চলে শ্রমিক ও মজুরের সংখ্যার উপর। মজুরির পরিবর্তনও এই কারণের উপর প্রধানত নির্ভরশীল ছিল। এ সম্পর্কে অবশ্য তথ্য বিশেষ নেই, কেবল বিদেশী কোম্পানির কাগজপত্রে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৬৭৫-৭৬ সালে বোম্বাইতে কারিগরদের আনার জন্য ইংরেজরা তাদের দৈনিক মজুরি তিন পয়সা থেকে বাড়িয়ে ছয় পয়সা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর আর একটা কারণ অবশ্য ছিল যে খাবারের দাম বেড়ে গিয়েছিল। এটা দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব দাক্ষিণাত্যের মজুরি পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের থেকে কিছুটা বেশি ছিল। সাধারণত দৈনিক মজুরি আড়াই আনা বলে ধরা যায়। কোনো কোনো সময়ে বাজারের চাহিদা বেড়ে গেলে ও কারিগরদের সংখ্যা কম হলে মজুরি বাড়বে এতে সন্দেহ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাপড়ের বাজারে যখন মন্দা চলছে তখন পশ্চিম উপকূলের ইংরেজরা পাথরের টুকরো (Bead) তৈরি করতে শুরু করে। যথেষ্ট সংখ্যক কারিগর না পাওয়ায় তারা মজুরি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এইসব শহরে নানা কারণে কারিগরদের সংখ্যা কমে গেলেও ঐ তুলনায় কারিগরদের মজুরি বাড়েনি। একটা মাত্রার পর বাজার হারানোর ভয়ে ইংরেজরা বা ভারতীয় বণিকরা মজুরি বাড়াতে রাজি হয় না।

Scanned with CamScanner

সাধারণ শহরের হস্তশিল্পের সঙ্গে কয়েকটা শহরের বড় বড় শিল্পসংস্থার পার্থক্য রয়েছে, যদিও এগুলির উৎপাদন পদ্ধতি হস্তশিল্পের থেকে আলাদা নয়। রাজকীয় কারখানা ও অভিজাতদের কারখানাগুলিকে সাধারণ শিল্পসংস্থা থেকে পৃথক বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও সুরাটে জাহাজ তৈরির কারখানাকে পৃথক বলে ধরা যেতে পারে এই অর্থে যে বহুসংখ্যক কারিগর এখানে বিশেষ বিশেষ অংশের কাজ করছে ও একটা কেন্দ্রীয় নির্দেশের উপর নির্ভরশীল। বড় বড় সৌধ ও প্রাসাদ নির্মাণও ঐ অর্থে পৃথক। ফরাসি পর্যটক তাভারনিয়ার *তাজমহল* তৈরিতে যে বিশাল সংখ্যক কারিগর নিযুক্ত হয়েছিল তার কথা বলেছেন। হীরকের খনিতেও বড় সংখ্যক কারিগর ছিল তারও উল্লেখ করেছেন। মুঘল সম্রাটদের প্রাসাদ তৈরিও এই ধরনের। আকবরের ফতেপুর সিক্রি তৈরির কাজে যে বিশাল সংখ্যায় কারিগর লেগেছিল এটি এখন সুবিদিত। সুতরাং উৎপাদন পদ্ধতি এক ধরনের হলেও কারিগরী শিল্পের মধ্যে স্তরভেদ আছে।

মুঘলদের সরকারী কারখানাতে দৈনিক মজুরির কথা আবুল ফজল বলেছেন যার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠাদের অনেকগুলি কারখানায় বেগার শ্রমিক খাটানো হত। এগুলি ছিল অবশ্য সরকারী কারখানা। বছরে সাধারণত আট দিন থেকে পনেরো দিন বিভিন্ন সরকারী বাড়ি নির্মাণ ও মেরামতিতে এই শ্রমিক খাটানো হত। অন্যান্য কারিগরদের বছরে পনেরো দিন থেকে দুই মাস ব্যবহার করা হয়েছে যার বদলে তারা কিছু পরিমাণে শস্য ও নগদ টাকা পেত। ইংরেজরা পরবর্তীকালে এই ধরনের কারখানা বন্ধ করে দেয়।

ভারত ভূখণ্ডে যে নানান ধরনের পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য বিভিন্ন ধরনের কারিগর তৈরি হচ্ছে। সপ্তদশ শতাব্দী হস্তশিল্পের স্বর্ণযুগ হলেও মুঘল ভারতের সমাজ ও শাসনব্যবস্থার ফলে কারিগরদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশাল বিদেশী মুদ্রা মুঘল ভারতে এলেও তার সামান্য অংশই কারিগররা পেয়েছিল। ফলে ওস্তাদ কারিগর তৈরি হয়নি, উৎপাদন ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়নি। নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ না করার ফলে ক্রমশ নতুন কলাকৌশলে উন্নত শক্তির কাছে মুঘল রাজশক্তির পরাজয় ঘটতে থাকে যার ফলে অবশেষে ঔপনিবেশিক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

Scanned with CamScanner